ইউনিট ৪

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- হাসুনির মায়ের প্রতি মজিদের আকর্ষণের কথা এবং এর ফলে মজিদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।

☞	মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন।

মূলপাঠ

পৌষের শীত। প্রান্তর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে হাড় কাঁপায়। গভীর রাতে রহীমা আর হাসুনির মা ধান সিদ্ধ করে। খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে, আলোকিত হয়ে ওঠেছে সারা উঠানটা। ওপরে আকাশ অন্ধকার। গনগনে আগুনের শিখা যেন সে-কালো আকাশ গিয়ে ছোঁয়। ওধারে ধোঁয়া হয়, শব্দ হয় সাপের। যেন শতসহস্র সাপ শিস দেয়।

শেষ রাতের দিকে মজিদ ঘর থেকে একবার বেরিয়ে আসে। খড়ের আগুনের উজ্জ্বল আলো লেপাজোকা সাদা উঠানটায় ঈষৎ লালচে হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করে। সে ঈষৎ লালচে উঠানের পশ্চাতে দেখে হাসুনির মাকে, তার পরনে বেগুনি শাড়িটা। যে-আলো সাদা মসৃণ উঠানটাকে শুভ্রতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে-আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গলা কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে। দেখে মজিদের চোখ এখানে অন্ধকারে চকচক করে।

কিছুক্ষণ পর ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে মজিদ আশ-পাশ করে। উঠান থেকে শিসের আওয়াজ এসে বেড়ার গায়ে সিরসির করে। তাই শোনে আর আশ-পাশ করে মজিদ। তারই মধ্যে কখন দ্রুততর, ঘনতর হয়ে ওঠে মুহূর্তগুলো।

এক সময় মজিদ আবার বেরিয়ে আসে। এসে কিছুক্ষণ আগে হাসুনির মায়ের উজ্জ্বল বাহু-কাঁধ-গলার জন্য যে-রহীমাকে সে লক্ষ করেনি, সে-রহীমাকেই ডাকে। ডাকের স্বরে প্রভুত্ব! দুনিয়ায় তার চাইতে এই মুহূর্তে অধিকতর শক্তিশালী অধিকতর ক্ষমতাবান আর কেউ নেই যেন। খড়কুটোর আলোর জন্য ওপরে আকাশ তেমনি অন্ধকার। সীমাহীন সে-আকাশ এখন কালো আবরণে সীমাবদ্ধ। মানুষের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে।

রহীমা ঘরে এলে মজিদ বলে,

–পা-টা একটু টিপা দিবা?

এ-গলার স্বর রহীমা চেনে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে মূর্তির মত কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে বলে,

–ওইধারে এত কাম, ফজরের আগে শেষ করণ লাগবো।

–থোও তোমার কাজ! মজিদ গর্জে ওঠে। গর্জাবে না কেন। যে-ধান সিদ্ধ হচ্ছে সে-ধান তো তারই। এখানে সে মালিক। সে-মালিকানায় এক আনারও অংশীদার নেই কেউ।

রহীমার দেহভরা ধানের গন্ধ। যেন জমি ফসল ধরেছে। ঝুঁকে-ঝুঁকে সে পা টেপে। ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মজিদ, আর ধানের গন্ধ শোকে। শীতের রাতে ভারি হয়ে নাকে লাগে সে-গন্ধ!

অন্ধকারে সাপের মত চকচক করে তার চোখ। মনের অস্থিরতা কাটে না। কাউকে সে জানাতে চায় কী কোন কথা? তারই দেয়া বেগুনি রঙের শাড়ি পরা মেয়েলোকটিকে–খড়কুটোর আলোতে তখন যার দেহের কতক অংশ জ্বলজ্বল

করছিলো উজ্জ্বল লালিত্যে—তাকে একটা কথা জানাতে চায় যেন। তবে জানানোর পথে বৃহৎ বাধার দেয়াল বলে রাত্রির এই মুহূর্তে অন্ধকার আকাশের তলে অসীম ক্ষমতাশীল প্রভুও অস্থির-অস্থির করে, দেয়াল ভেদ করার সূক্ষ্ম , ঘোরালো পন্থার সন্ধান করতে গিয়ে অধীর হয়ে পড়ে।

তখন পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। উঠানে আগুন নিভে এসেছে, উত্তর থেকে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রহীমা ফিরে এসে মুখ তুলে চায় না। হাসুনির মা দাঁতে চিবিয়ে দেখছিলো, ধান সিদ্ধ হয়েছে কিনা। সেও তাকায় না রহীমার পানে। কথা বলতে গিয়ে মুখে কথা বাধে।

তারপর পূব আকাশ হতে স্বপ্নের মত ক্ষীণ, শ্লথগতি আলো এসে রাতের অন্ধকার যখন কাটিয়ে দেয় তখন হঠাৎ ওরা দুজনে চমকে ওঠে। মজিদ কখন ওঠে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়তে শুরু করেছে। হালকা মধুর কণ্ঠ গ্রীষ্ম প্রত্যূষের ঝিরঝির হাওয়ার মত ভেসে আসে!

ওরা তাকায় পরস্পরের পানে। নোতুন এক দিন শুরু হয়েছে খোদার নাম নিয়ে। তাঁর নামোচ্চারণে সংকোচ কাটে।

লোকদের সে যাই বলুক বতোর দিনে মজিদ কিন্তু ভুলে যায় গ্রামের অভিনয়ে তার কোন পালা। মাজারের পাশে গত বছরে ওঠানো টিন আর বেড়ার ঘর মগড়ার পর মগড়া ধানে ভরে ওঠে। মাজার জেয়ারত করতে এসে লোকেরা চেয়ে চেয়ে দেখে তার ধান। গভীর বিস্ময়ে তারা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, মজিদকে অভিনন্দিত করে। শুনে মজিদ মুখ গম্ভীর করে। দাড়িতে হাত বুলিয়ে আকাশের পানে তাকায়। বলে, খোদার রহমত। খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা। তারপর ইঙ্গিতে মাজারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, আর তানার দোয়া।

শুনে কারো কারো চোখ ছলছল করে ওঠে, আর আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ! কেন আসবে না। ধান হয়েছে এবার । মজিদের ঘরে যেমন মগড়াগুলো উপচে পড়ছে ধানের প্রাচুর্যে, তেমনি ঘরে-ঘরে ধানের বন্যা। তবে জীবনে যারা অনেক দেখেছে, যারা সমঝদার, তারা অহঙ্কার দাবিয়ে রাখে। ধানের প্রাচুর্যে কারো কারো বুকে আশঙ্কাও জাগে।

বস্তুত, মজিদকে দেখে তাদের আসল কথা স্মরণ হয়। খোদার রহমত না হলে মাঠে-মাঠে ধান হতে পারে না। তাঁর রহমত যদি শুকিয়ে যায়—বর্ষিত না হয়, তবে খামার শূন্য হয়ে খাঁখাঁ করে। বিশেষ দিনে সে-কথাটা স্মরণ করবার জন্য মজিদের মত লোকের সাহায্য নেয়। তার কাছেই শোকর গুজার করবার ভাষা শিখতে আসে।

অপূর্ব দীনতায় চোখ তুলে মজিদ বলে, দুনিয়াদারী কি তার কাজ? খোদাতা'লা অবশ্য দুনিয়ার কাজ কামকে অবহেলা করতে বলেন নি, কিন্তু যার অন্তরে খোদা-রসুলের স্পর্শ লাগে, তার কী আর দুনিয়াদারি ভালো লাগে?

—ব'লে মজিদ চোখ পিট-পিট করে—যেন তার চোখ ছলছল করে ওঠেছে। যে শোনে সে মাথা নাড়ে ঘন-ঘন অস্পষ্ট গলায় সে আবার বলে,

—খোদার রহমত সব।

আরো বলে যে, সে রহমতের জন্য সে খোদার কাছে হাজারবার শোকর গুজারী করে। কিন্তু আবার দুমুঠো ভাত খেতে না পেলেও তার চিন্তা নেই। খোদার ওপর যার প্রাণ-মন-দেহ ন্যস্ত এবং খোদার ওপর যে তোয়াক্কা করে, তার আবার এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে ভাবনা! বলতে বলতে এবার একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে মজিদের মুখে, কোটরাগত চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে।

কিন্তু আজ সকালে মজিদের সে-চোখে একটা জ্বালাময় ছবি ভেসে ওঠে থেকে-থেকে। গনগনে আগুনের পাশে বেগুনি রঙের শাড়ি পরা একটি অস্পষ্ট নারীকে দেখে। স্মৃতিতে তার উলঙ্গ বাহু ও কাঁধ আরো শুভ্র হয়ে ওঠে। তার যে-চোখে দিগন্তপ্রসারী দূরত্ব জেগে ওঠে, সে-চোখ ক্রমশ: সূক্ষ্ম ও সূচাগ্র তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে।

হঠাৎ সচেতন হয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—তোমার কেমন ধান হইল মি:া?

তুমি বলুক আপনি বলুক সকলকে মি:া বলে সম্বোধন করার অভ্যাস মজিদের। লোকটি ঘাড় চুলকে নিতি-বিতি করে বলে, —যা-ই হইছে তাই যথেষ্ট। ছেলেপুলে লইয়া দুই বেলা খাইবার পারুম।

আসলে এদের বড়াই করাই অভ্যাস। পঞ্চাশ মন ধান হলে অন্তত একশ মন বলা চাই। বতোর দিনে উঁচিয়ে উঁচিয়ে রাখা ধানের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করানো চাই। লোকটির ধান ভালোই হয়েছে, বলতে গেলে গত দশ বছরে এমন

ফসল হয় নি। কিন্তু মজিদের সামনে বড়াই করা তো দূরের কথা, ন্যায্য কথাটা বলতেই তার মুখে কেমন বাধে। তাছাড়া, খোদার কালাম জানা লোকের সামনে ভাবনা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। কী কথা বললে কি হবে বুঝে না ওঠে সতর্কতা অবলম্বন করে।

কথার কথা কয় মজিদ, তাই উত্তরের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। তার অন্তরে ক্রমশ যে-আগুন জ্বলে উঠছে, তারই শিখার উত্তাপ অনুভব করে। সে-উত্তাপ ভালোই লাগে।

লোকটি অবশেষে ওঠে দাঁড়ায়। তবে যাবার আগে হঠাৎ এমন একটা কথা বলে যে, মজিদ যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই বৃক্ষের মত দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। এবং যে-আগুন জ্বলে উঠছিল অন্তরে, তা মুহূর্তে নির্বাপিত হয়।

শব্দার্থ ও টীকা

শত সহস্র সাপ শিস দেয় – গনগনে আগুনের উত্তাপে যে ধোয়া হয় এবং ভাষা ওঠে তাতে এক ধরনের শব্দ হয়। লেখক এই শব্দকে সাপের শিষ দেয়ার শব্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ তুলনা আগুনের ভয়াবহতার সঙ্গে মজিদের মনে জাগ্রত কামুকতার চিত্র বলে ধারণা করা যায়। **তানার দোয়া** – এখানে লালসালুর নিচে শায়িত বলে কল্পিত মোদাচ্ছের পীরের কথা বলা হয়েছে। **অহঙ্কার দাবিয়ে রাখে** – বড়াই করার ভাব গোপন রাখে। **শোকর গুজার করবার ভাষা** – আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য দোয়া, যে ভাষায় ও প্রশংসায় আল্লাহ সন্তুষ্ট হন সেরকম ভাষা। **তোয়াক্কল** – ভরসা বা নির্ভর। **দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে** – অনেক দূরের সীমানায়। **নিতিবিতি করে** – সংকোচ ও ইতস্তত করে।

পাঠসংক্ষেপ

পৌষ মাসের প্রচুর নতুন ধান আসে মজিদের ঘরে। মজিদের স্ত্রী রহীমা আর হাসুনীর মা রাত জেগে ধান সিদ্ধ করে। চারদিকে আগুনের হলকা আর ধোঁয়া আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। মজিদ লাল আগুনের হল্কায় হাসুনির মাকে দেখে আকৃষ্ট হয়। তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে না। অবশেষে সে অস্থির হয়ে বিছানা থেকে ওঠে এসে রহীমাকে ডাক দেয় এবং তার পাদুটি টিপে দিতে বলে। রহীমা শেষ রাতে ভোর হওয়ার একটু আগে আবার ধানের কাছে চলে আসে। হাসুনির মা কোন কথা বলে না সংকোচে। ভোর হয়ে আসে এভাবে।

মজিদের ঘর ধানে ধানে ভরে ওঠে এ বছর মজিদ বলে আল্লাহর রহমতেই এসব হয়েছে। আর তার ওপর রয়েছে লালসালুতে আবৃত কবরের নিচের মোদাচ্ছের পীরের বিশেষ দোয়া। গভীর কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে ওঠে। সে তার কাছে আসা লোকজনদের খোদাতালার মাহাত্ম্যবর্ণনা করে। তার ছোট ছোট দুটি চোখের চাওনি দৃষ্টি সীমার অনেক দূরে চলে যায়। কিন্তু এসব মাহাত্ম্যবর্ণনার সময় তার মনের গভীরে ভাসতে থাকে হাসুনির মায়ের চেহারা। মনের এ ভাব ঢাকবার জন্য সে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করে বলে এ বছরের ফসলের প্রাচুর্যের কথা। তবে তার কাছে আসা লোকজন ফসলের প্রাচুর্যের কথা মজিদকে বলতে কিছুটা ভয় পায়। কারণ আল্লাহর কালাম জানা লোকের সামনে যেন তেন কথা মন খুলে বলা যায় না। এদিকে মজিদের অন্তরে অন্য ধরনের ব্যথা বাড়তে থাকে, মাথায় আগুন চড়তে থাকে। আর তা হল হাসুনির মায়ের ভিন্নতর রূপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হাসুনির মায়ের প্রতি মজিদ আকৃষ্ট হয় কেন?

২. 'মানুষের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে।' কোন প্রসঙ্গে লেখক একথা বলেছেন? এর তাৎপর্য কী?

৩. আল্লাহর ওপর এত ভরসা সত্ত্বেও মজিদের চোখে জ্বালাময় ছবি ভেসে ওঠে কেন?

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. অন্ধকারে সাপের মত চকচক করে তার চোখ।

২. যার অন্তর খোদা-রসূলের স্পর্শ লাগে তার কী দুনিয়াদারী আর ভালো লাগে?

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- নতুন পীর সাহেবের আগমনে মজিদের মনে যে আশঙ্কা ও ক্রোধ সৃষ্টি হয়, তার বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

সংক্ষেপে ব্যাপারটি হলো এই। –গৃহস্থদের গোলায়-গোলায় যখন ধান ভরে ওঠে তখন দেশময় আবার পীরদের সফর শুরু হয়। এই সময় খাতির যত্নটা হয়, মানুষের মেজাজটাও খোলাসা থাকে। যেবার আকাল পড়ে, সেবার অতি ভক্ত মুরিদের ঘরেও দুদিন গা ঢেলে থাকতে ভরসা হয় না পীর সাহেবদের।

দিন কয়েক হলো তিন গ্রাম পরে এক পীর সাহেব এসেছেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁ তাঁর পুরোনো মুরিদ। তিনি সেখানেই ওঠেছেন।

পীর সাহেবের যথেষ্ট বয়স। লোকে বলে, এক কালে আগুন ছিলো তাঁর চোখে, আর কণ্ঠে বজ্রনিনাদ। একথা তাঁর পূর্বপুরুষ মধ্যপ্রাচ্যের কোন এক স্থান থেকে নাকি খোদার বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড পথশ্রম স্বীকার করে এ-দূর দেশে আসেন। সে কতদিন আগে তা পীর সাহেবও সঠিকভাবে জানেন না। কিন্তু এ-অজ্ঞতা স্বীকার্য নয় বলে কোন এক পাঠান বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে হিসাব মিলিয়ে সে-স্মরণীয় আগমনকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ণীত করা হয়।

যে-দেশ ছেড়ে এসেছেন, সে-দেশের সঙ্গে আজ অবশ্য কোন সম্বন্ধ নেই–কেবল বৃহৎ খড়্গনাসা গৌরবর্ণ চেহারাটি ছাড়া। ময়মনসিংহ জেলার কোন এক অঞ্চলে বংশানুক্রমে বসবাস করছেন বলে তাঁদের ভাষাটাও এমন বিশুদ্ধভাবে স্থানীয় রূপ লাভ করেছে যে, মুরিদানির কাজ করবার প্রাক্কালে উত্তর-ভারতে কোন এক স্থানে গিয়ে তাঁকে উর্দূ জবান এস্তেমাল করে আসতে হয়েছিল।

পীর সাহেবের খ্যাতির শেষ নেই, তাঁর সম্বন্ধে গল্পেরও শেষ নেই। সে গল্প তাঁর রুহানি তা'কত ও কাশ্‌ফ নিয়ে। মাজারের ছায়ার তলে আছে বলে সমাজে জানাজা-পড়ানো খোন্‌কার মোল্লার চেয়ে মজিদের স্থান অনেক উঁচুতে, কিন্তু রূহানি তা'কত তার নেই বলে অন্তরে অন্তরে দীনতা বোধ করে। কখনো কখনো খোলাখুলিভাবে লোকসমক্ষে সে-দীনতা প্রকাশের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে মজিদ নিশ্চিত থাকে।

কিন্তু জাঁদরেল পীররা যখন আশে-পাশে এসে আস্তানা গাড়েন তখন মজিদ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মত মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে-একে জড়িয়ে পড়বে।

অন্যের আত্মা শক্তিতে অবশ্য মজিদের খাঁটি বিশ্বাস নেই। আপন হাতে সৃষ্ট মাজারের পাশে বসে দুনিয়ার অনেক কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না। তবে এসব তার অন্তরের কথা, প্রকাশের কথা নয়। এতএব কিছুমাত্র বিশ্বাস ছাড়াও সে আশ্চর্য ধৈর্যসহকারে অন্যের ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে। বলে, খোদাতা'লার ভেদ বোঝা কী সহজ কথা? কার মধ্যে তিনি কী বস্তু দিয়েছেন সে কেবল তিনিই বলতে পারেন।

এবার মজিদের মন কিন্তু কদিন ধরে থম থম করে। সব সময়েই হাওয়ায় ভেসে আসে পীর সাহেবের কার্যকলাপের কথা। এ-দিকে মাজারে লোকদের আসা-যাওয়াও প্রায় থেমে যায়। বতোর দিনে মানুষের কাজের অন্ত নেই ঠিক। কিন্তু যে-টুকু অবসর পায় তা তারা ব্যয় করতে থাকে পীর সাহেবের বাতরস-স্ফীত পদযুগলে একবার চুমু দেবার আশায়। পদচুম্বন অবশ্য সবার ভাগ্যে ঘটে না। দিনের পর দিন ভিড় ঠেলে অতি নিকটে পৌঁছেও অনেক সময় বাসনা চরিতার্থ হয় না। সন্নিকটে গিয়ে তার নুরানি চেহারার দীপ্তি দেখে কারো চোখ ঝল্‌সে যায়, কারো এমন চোখ ভাসানো কান্না পায় যে, আর এগোবার আশা ত্যাগ করতে হয়। ভাগ্যবান যারা, তারা পীর সাহেবের হাতের স্পর্শ হতে শুরু করে দু-এক শব্দ আদেশ-উপদেশ বা তামাক গন্ধ ভারি বুকের হাওয়াও লাভ করে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মজিদ গম্ভীর হয়ে থাকে। রহীমা গা টেপে, কিন্তু টেপে যেন, আস্ত পাথর। অবশেষে মজিদকে সে প্রশ্ন করে—আপনার কী হইছে?

মজিদ কিছু বলে না।

উত্তরের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করে রহীমা হঠাৎ বলে,

—এক পীর সাহেব আইছেন না হেই গেরামে, তানি নাকি মরা মাইনষেরে জিন্দা কইরা দেন?

পাথর এবার হঠাৎ নড়ে। আবছা অন্ধকারে মজিদের চোখ জ্বলে ওঠে। ক্ষণকাল নীরব থেকে হঠাৎ কটমট করে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে,

—মরা মানুষ জিন্দা হয় ক্যামনে?

প্রশ্নটা কৌতূহলের নয় দেখে রহীমা দমে গেলো। তারপর আর কোন কথা হয় না। এক সময় রহীমা পাশে শুয়ে আলগোছে ঘুমিয়ে পড়ে।

মজিদ ঘুমোয় না। সে বুঝেছে ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, এবার কিছু একটা না করলে নয়। আজও অপরাহ্নে সে দেখেছে, মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে দলে লোক চলছে উত্তর দিকে।

মজিদ ভাবে আর ভাবে। রাত যত গভীর হয় তত আগুন হয়ে ওঠে মাথা। মানুষের নির্বোধ বোকামির জন্য আর তার অকৃতজ্ঞতার জন্য একটা মারাত্মক ক্রোধ ও ঘৃণা উষ্ণ রক্তের মধ্যে টগবগ করতে থাকে। সে ছটফট করে একটা নিষ্ফল ক্রোধে।

এক সময় ভাবে, ঝালর-দেয়া সালু কাপড়ে আবৃত নকল মাজারটিই এদের উপযুক্ত শিক্ষা, তাদের নিমকহারামির যথার্থ প্রতিদান। ভাবে, একদিন মাথার খুন চড়ে গেলে সে তাদের বলেই দেবে আসল কথা। বলে দিয়ে হাসবে হা-হা করে গগন বিদীর্ণ করে। শুনে যদি তাদের বুক ভেঙে যায় তবেই তৃপ্ত হবে তার রিক্ত মন। মজিদ তার ঘরবাড়ি বিক্রি করে সরে পড়বে দুনিয়ার অন্য পথে-ঘাটে। এ-বিচিত্র বিশাল দুনিয়ায় কী যাবার জায়গার কোন অভাব আছে?

অবশ্য এ-ভাবনা গভীর রাতে নিজের বিছানায় শুয়েই সে ভাবে। যখন মাথা শীতল হয়, নিষ্ফল ক্রোধ হতাশায় গলে যায়, তখন সে আবার গুম হয়ে থাকে। তারপর শ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ মনে হঠাৎ একটি চিকন বুদ্ধিরশ্মি প্রতিফলিত হয়।

শীঘ্র তার চোখ চকচক করে ওঠে, শ্বাস দ্রুততর হয়। উত্তেজনায় আধা ওঠে বসে অন্ধকার ভেদ করে রহীমার পানে তাকায়। পাশে সে অঘোর ঘুমে বেচাইন। একটি হাঁটু উলঙ্গ হয়ে মজিদের দেহ ঘেষে আছে।

তাকেই অকারণে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে-চেয়ে দেখে মজিদ, তারপর আবার চিৎ হয়ে শুয়ে চোখখোলা মৃতের মত পড়ে থাকে।

শব্দার্থ ও টীকা

বজ্রনিনাদ – মেঘের প্রচণ্ড শব্দের মতো কণ্ঠের আওয়াজ। **এস্তেমাল** – ব্যবহার করা। **রুহানি তাকত** – আত্মিক শক্তি। **কাশ্‌ফ** – উন্মোচিত। **নির্ণীত করা** – স্থির বা ধার্য করা। ধরে নেওয়া। **খড়্গনামা গৌরবর্ণ চেহারা** – ধারালো নাক আর সুন্দর উজ্জ্বল রঙের চেহারা। **রুহানি তাকত** – আত্মিক শক্তি। **দীনতাবোধ** – নিজেকে ছোট মনে করা নিজের ক্ষুদ্রতাবোধ। **শঙ্কিত** – ভীত। **কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের** – অত্যন্ত চোট ও ক্ষণ স্থায়ী। **বাতরসস্ফীত পদযুগলে** – পীর সাহেবের মোটাসোটা ফোলা পা। লেখক ব্যঙ্গ করে পীরের পায়ের মোটামোটা রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, বাতরসের জন্যই পীর সাহেবের পা দুটো অত মোটা। **বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার** – মিথ্যা আশ্বাস ও নানা প্রলোভনের দোহাই দিয়ে সরল লোকজনকে আকৃষ্ট করে ফেলা, অনেকটা মায়াজালে আবদ্ধ করার মত। **নুরানী চেহারার দীপ্তি** – পীর সাহেবের চেহারার মধ্যে যে সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা তাকে নূরের ছটার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। **তামাক গন্ধ ভারী বুকের হাওয়া** – পীর সাহেব প্রায় সময় যেহেতু সুগন্ধী তামাক পানে রত থাকেন তাই তাঁর দোওয়া চাওয়ার জন্য যে কেউ কাছে গেলেই বা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে সেই মিষ্টি গন্ধে আবিষ্ট হতে হয়। তামাকের সেই মিষ্টি গন্ধটা যেন পীর সাহেবের বুক থেকে বেরিয়ে আসে।

পাঠসংক্ষেপ

যে বছর গ্রামে প্রচুর ধান হয় সে বছর পীরের আগমনও ঘটে বেশি। এবারও মতিগঞ্জ থেকে তিন গ্রাম দূরে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁর বাড়িতে এক বিরাট পীর এসেছেন। মতলুব খাঁ ঐ পীরের মুরিদ। পীরের আগমনে চারদিকে যে একটা তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে মজিদ তা টের পায়। টের পায় এ জন্যে যে মাজারে লোকজন আসা কমে গেছে। সবাই ছুটেছে ঐ পীরের কাছে। মজিদ রাতে রহীমার মুখে সেই পীরের কথা শুনে জ্বলে ওঠে রাগে। এবার সে শংঙ্কিত না হয়ে পারে না। রাগে ও ক্ষোভে সে ফেটে পড়ে মতিগঞ্জের লোকদের প্রতি। একবার ভাবে সে তার সৃস্ট নকল মাজারটির কথা গ্রামবাসীদের জানিয়ে মজা করবে, প্রতিশোধ নেবে। তারপর এখান থেকে চলে যাবে অন্য আস্ত ানায়। কিন্তু ক্রমে তার রাগ কমে আসে, মাথা ঠাণ্ডা হয়। মৃতের মত চোখ দুটি খোলা রেখে চিত হয়ে শুয়ে তাকে রাতের বিছানায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পীর সাহেবের আসার কারণ কি? তিনি দেখতে কেমন?
২. মাজার সম্পর্কে মজিদের নিজের ভাবনার পরিচয় দিন।
৩. মজিদের মন থম থম করে কেন?
৪. মজিদের ক্রোধ হয় কেন?
৫. এ পাঠের কাহিনী নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

প্রশ্ন : পীর সাহেবের আসার কারণ কি? তিনি দেখতে কেমন?

উত্তর : গৃহস্থ বাড়িতে গোলায় ধান ওঠার পর পীরেরা সফরে বের হন। নানা জায়গায় পীরের দুএকটা মুরিদ থাকে। ধান ওঠার পর মুরিদের বাড়িতে এলে পীরের খাতির যত্ন বেশি হয়। কারণ ধান থাকার জন্যে মানুষের মনও এ সময় প্রসন্ন থাকে।

পীর সাহেব এসেছেন এ জন্য যে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁ তাঁর মুরিদ। পীর সাহেব এর বাড়িতেই ওঠেছেন।

পীর সাহেবের বেশ বয়স। তাঁর পূর্বপুরুষ মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছেন বলে কথিত আছে। পীর সাহেবের গায়ের রং ফর্সা এবং তিনি উন্নত নাসা সুপুরুষ।

প্রশ্ন : মাজার সম্পর্কে মজিদের নিজের ভাবনার পরিচয় দিন।

উত্তর : মাজার সম্পর্কে মজিদের নিজের কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। কারণ এ মাজার যে মোদাচ্ছের পীরের মাজার নয় এ কথা মজিদই ভালো জানে। আসলে মোদাচ্ছের পীর বলে কেউ নেই। মজিদ একটি ভাঙা কবরকে মোদাচ্ছের পীরের মাজার বলে চালিয়েছে। এ মাজার মজিদের সৃষ্টি। এর সব কিছু মজিদ জানে। সুতরাং এ মাজার সম্পর্কে মজিদের কোনো বিশ্বাস থাকার কথা নয়।

প্রশ্ন : মজিদের মন থম থম করে কেন?

উত্তর : মজিদের মন থম থম করে এ জন্য যে পীর সাহেবের আগমনে সে সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে। পীর সাহেবের মতো রুহানি শক্তি তার নেই। তা ছাড়া লোকজন মজিদের চেয়ে পীরকে বেশি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। পীর সাহেবের আসার পর থেকে মাজারে ও লোকজন কম আসে। লোকজন ছোটে আওয়ালপুরে পীর সাহেবের কাছে। তাঁকে একটু

দেখতে চায়, তাঁর পায়ে একটু চুমু দিতে চায়। এসব দেখে শুনে মজিদ গম্ভীর হয়ে যায়। মাজারে লোক না এলে মজিদের রুজি রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। গ্রামের লোকের ওপর মজিদের প্রভাবও কমে যাবে।

প্রশ্ন : মজিদের ক্রোধ হয় কেন?

উত্তর : রাতে শোয়ার সময় মজিদের স্ত্রী রহীমা পীর সাহেবের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। এতে মজিদ বোঝে যে ব্যাপার অনেক দূর এগিয়েছে। তাছাড়া পরদিন মজিদ দেখে লোকজন সব পীরের কাছে ছুটে চলেছে। এতে মজিদ মনে মনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়। মজিদ জানে পীর সাহেবও তার মত ভণ্ড। অথচ পীরের প্রতি তার নিজের এলাকার লোকও শ্রদ্ধাবান। গাঁয়ের লোকজনের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ হয়। তাঁর মনে হয় এরা সব বিশ্বাসঘাতক। ক্রুদ্ধ হয়ে মজিদ নকল মাজারের রহস্য সবাইকে জানিয়ে দেয়ার কথাও ভাবে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. আপন হাতে সৃষ্ট মাজারের পাশে বসে দুনিয়ার অনেক কিছুতে তার বিশ্বাস হয় না।
২. এ বিচিত্র বিশাল দুনিয়ায় কী যাবার জায়গার কোন অভাব আছে?

নমুনা উত্তর

এ বিচিত্র বিশাল দুনিয়ায় কী যাবার জায়গার কোন অভাব আছে?

আলোচ্য লাইনটি সেয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে। গাঁয়ের লোকজনের প্রতি ক্রুদ্ধ মজিদের মনোভাবের পরিচয় এখানে প্রকাশ করা হয়েছে।

আওয়ালপুরে এক পীর সাহেব আসাতে লোকজন সব তাঁর কাছে ছুটছে। মাজারের লোকজন আসা কমে যায়। এতে মজিদ বিপদ গণে। মাজারে লোক না এলে তার প্রতিপত্তি কমে যাবে। তখন এ গ্রামে থাকা অর্থহীন। মজিদ লোকজনের এ ব্যবহারকে মনে করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা। সে একবার ভাবে নকল মাজারের রহস্য সবাইকে বলে দেবে। তারপর সে ঘরবাড়ি বিক্রি করে অন্য জায়গায় চলে যাবে। মজিদ ভাগ্যান্বেষী মানুষ। সে অন্য জায়গা থেকে এসে মহব্বতনগরে আস্তানা করেছে। এখন এখানে যদি তার ভালোভাবে থাকবার উপায় না থাকে তাহলে অন্যত্র সে তার ভবিষ্যৎ দেখবে।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- পীর সাহেবের প্রতি ভক্তিমান মহব্বতনগরের লোকদের কীভাবে মজিদ আবার তার প্রভাবে নিয়ে এল সে কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মজিদ যখন আওয়ালপুর গ্রামে পৌঁছলো তখন সূর্য হেলে পড়ছে। মতলুব মি:ার বাড়ির সামনেকার মাঠটা লোকে লোকারণ্য। তার মধ্যে কোথায় যে পীর সাহেব বসে আছেন বোঝা মুশ্‌কিল। মজিদ বেঁটে মানুষ। পায়ের আঙুলে দাঁড়িয়ে বকের মত গলা বাড়িয়ে পীর সাহেবকে একবার দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু কালো মাথার সমুদ্রে দৃষ্টি কেবল ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে।

একজন বললে যে, বটগাছটার তলে তিনি বসে আছেন। তখন মাঘের শেষাশেষি। তবু জন-সমুদ্রের উত্তাপে পীর সাহেবের গরম লেগেছে বলে তাঁর গায়ে হাতির কানের মত মস্ত ঝালরওয়ালা পাখা নিয়ে হাওয়া করছে একটি লোক। কেবল সে-পাখাটা থেকে থেকে নজরে পড়ে।

মুখ তুলে রেখে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগলো মজিদ। সামনে শত শত লোক সব বিভোর হয়ে বসে আছে, কেউ কাউকে লক্ষ্য করবার কথা নয়। মজিদকে চেনে এমন লোক ভিড়ের মধ্যে অনেক আছে বটে, কিন্তু তারা কেউ আজ তাকে চেনে না। যেন বিশাল সূর্যোদয় হয়েছে, আর সে-আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পীর সাহেব আজ দফায়-দফায় ওয়াজ করছেন। যখন ওয়াজ শেষ করে তিনি বসে পড়েন তখন অনেকক্ষণ ধরে তার বিশাল বপু দ্রুত শ্বসনের তালে তালে ওঠা-নাবা করে, আর শুভ্র চওড়া কপালে জমে ওঠা বিন্দু-বিন্দু ঘাম খোলা মাঠের উজ্জ্বল আলোয় চকচক করে। পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি জোরে হাত চালায়।

এ-সময় পীর সাহেবের প্রধান মুরিদ মতলুব মিয়া হুজুরের গুণাগুণ সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলে। একথা সর্বজনবিদিত যে, সে বলে, পীর সাহেব সূর্যকে ধরে রাখবার ক্ষমতা রাখেন। উদাহরণ দিয়ে বলে হয়তো তিনি এমন এক জরুরী কাজে আটকে আছেন যে ওধারে জোহরের নামাজের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হলে কী হবে, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না হুকুম দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য এক আঙুল নড়তে পারে না। শুনে কেউ আহা-আহা করে, কারো-বা আবার ডুকরে কান্না আসে।

কেবল মজিদের চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে। সজোরে নড়তে থাকা পাখাটার পানে তাকিয়ে সে মূর্তিবৎ বসে থাকে।

আধ ঘণ্টা পরে শীতের দ্বিপ্রাহরিক আমেজে জনতা ঈষৎ ঝিমিয়ে এসেছে, এমনি সময় হঠাৎ জমায়েতের নানাস্থান থেকে রব উঠলো। একটা ঘোষণা মুখে-মুখে সারা ময়দানে ছড়িয়ে পড়লো। –পীর সাহেব আবার ওয়াজ করবেন।

পীর সাহেবের আর সে-গলা নেই। সূক্ষ্ম তারের কম্পনের মত হাওয়ায় বাজে তাঁর গলা। জমায়েতের কেউ না কেউ প্রতি মুহূর্তে হা-হা করে উঠছে বলে সে-ক্ষীণ আওয়াজও সব প্রান্তে শোনা যায় না। কিন্তু মজিদ কান খাড়া করে শোনে, এবং শোনবার প্রচেষ্টার ফলে চোখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

পীর সাহেবের গলার কম্পমান সূক্ষ্ম তারের মত ক্ষীণ আওয়াজই আধ ঘণ্টা ধরে বাজে। তারপর বিচিত্র সুর করে তিনি একটা ফারসি বয়েত বলে ওয়াজ ক্ষান্ত করেন।

বলেন, সোহবতে সো'য়ালে তুরা সো'য়ালে কুনাদ (সুসঙ্গ মানুষকে ভালো করে)। শুনে জমায়েতের অর্ধেক লোক কেঁদে ওঠে। তারপর তিনি যখন বাকিটা বলেন–সোহবতে তো'য়ালে তুরা তো'য়ালে কুনাদ (কুসঙ্গ তেমনি তাকে আবার খারাপ করে) –তখন গোটা জমায়েতের সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়, সকলে হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে।

বসে পড়ে পীর সাহেব পাখাওয়ালার পানে লাল-হয়ে ওঠা চোখে তাকিয়ে পাখা সঞ্চালন দ্রুততর করবার জন্য ইশারা করছেন এমন সময়ে সামনের লোকেরা সব ছুটে গিয়ে পীর সাহেবকে ঘেরাও করে ফেললো। হঠাৎ পাগল হয়ে ওঠেছে তারা। যে যা পারলো ধরলো, –কেউ পা, কেউ হাত, কেউ আস্তিনের অংশ।

তারপর এক কাণ্ড ঘটলো। মানুষের ভাবমত্ততা দেখে পীর সাহেব অভ্যস্ত। কিন্তু আজকের ক্রন্দনরত জমায়েতের নিকটবর্তী লোকগুলোর সহসা এ আক্রমণ তাঁর বোধ হয় সহ্য হলো না। তিনি হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যুবকের সাবলীল সহজ ভঙ্গিতে মাথার ওপরে গাছটার ডালে ওঠে গেলেন। দেখে হায়-হায় করে উঠলো পীর সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা, আর তা-শুনে জমায়েতও হায়-হায় করে উঠলো। সাঙ্গ-পাঙ্গরা তখন সুর করে গীত ধরলে এ মর্মে যে, তাদের পীর সাহেব তো শূন্যে ওঠে গেছেন, এবার কী উপায়!

পীর সাহেব অবশ্য ডালে বসে তখন দিব্যি বাতরস-ভারি পা দোলাচ্ছেন।

ফাগুনের আগুনের দ্রুতবিস্তারের মত পীর সাহেবের শূন্যে ওঠার কথা দেখতে-না দেখতে ছড়িয়ে গেলো। যারা তখন ফারসি বয়েতের অর্থ না বুঝে কেবল সুর শুনেই কেঁদে ওঠেছিলো, এবার তারা মরা-কান্না জুড়ে বসলো। পীর সাহেব কী তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছেন? কিন্তু গেলে, অজ্ঞ-মূর্খ তারা পথ দেখবে কী করে?

জোয়ারী ঢেউ-এর মত সম্মুখে ভেঙে এলো জনস্রোত। অনেক মরা-কান্না ও আকুতি-বিকুতির পর পীর সাহেব বৃক্ষডাল হতে অবশেষে অবতরণ করলেন।

বেলা তখন বেশ গড়িয়ে এসেছে, আর মাঠের ধারে গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে সে মাঠেরই বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে, এমন সময় পীর সাহেবের নির্দেশে একজন হঠাৎ ওঠে দাঁড়িয়ে বললে,

—ভাই সকল, আপনারা সব কাতারে দাঁড়াইয়া যান।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নামাজ শুরু হয়ে গেলো।

নামাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এমন সময় হঠাৎ সারা মাঠটা যেন কেঁপে উঠলো। শতশত নামাজরত মানুষের নীরবতার মধ্যে খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্ণ তায় নি:সঙ্গ একটা গলা আর্তনাদ করে উঠলো।

সে-কণ্ঠ মজিদের।

—যতসব শয়তানি, বে'দাতি কাজকারবার। খোদার সঙ্গে মস্করা! নামাজ ভেঙে কেউ কথা কইতে পারে না। তাই তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই নীরবে মজিদের অশ্রাব্য গালাগালি শুনলে।

মোনাজাত হয়ে গেলে সাঙ্গ-পাঙ্গদের তিনজন এগিয়ে এলো। একজন কঠিন গলায় প্রশ্ন করলো,

—চেঁচামিচি করতা কিছকা ওয়াস্তে?

লোকটি আবার পশ্চিমে এলেম শিখে এসে অবধি বাংলা জবানে কথা কয় না।

মজিদ বললে,

কোন্ নামাজ হইলো এটা?

—কাহে? জোহরকা নামাজ হুয়া। উত্তর শুনে আবার চীৎকার করে গালাগাল শুরু করলো মজিদ। বলরে, এ কেমন বেশরিয়তি কারবার, আছরের সময় জোহরের নামাজ পড়া?

সাঙ্গ-পাঙ্গরা প্রথমে ভালোভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করলো ব্যাপারটা। তারা বললে যে, মজিদ তো জানেই পীর সাহেবের হুকুম ব্যতীত জোহরের নামাজের সময় যেতে পারে না। পশ্চিম থেকে যে এলেম শিখে এসেছে সে বোঝানোর পন্থাটা প্রায় বৈজ্ঞানিক করে তোলে। সে বলে যে, যেহেতু ভাদ্র মাস ছেকে ছায়া আছলী এক-এক কদম করে বেড়ে যায়, সেহেতু দু-কদমের ওপর দুই লাঠি হিসেব করে চমৎকার জোহরের নামাজের সময় আছে।

মজিদ বলে, মাপো। এবং পীর সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা যতদূর সম্ভব দীর্ঘ দীর্ঘ ছয় কদম ফেলে তার সঙ্গে দুই লাঠি যোগ করেও যখন ছায়ার নাগাল পেলো না তখন বললে, তর্ক যখন শুরু হয়েছিলো তখন ছায়া ঠিক নাগালের মধ্যে ছিলো।

শুনে মজিদ কুৎসিততমভাবে মুখ বিকৃত করে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার মুখ খিস্তি করে বলে,

—কেন, তখন তোগো পীর ধইরা রাখবার পারলো না সুরুযটারে? তারপর সরে গিয়ে সে বজ্রকণ্ঠে ডাকলে,

মহ্বতনগর যাইবেন কে কে?

মহব্বতনগর গ্রামের লোকেরা এতক্ষণ বিমূঢ় হয়ে ব্যাপারটা দেখছিলো। কারো কারো মনে ভয়ও হয়েছিলো— এ বুঝি পীর সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা ঠেঙিয়ে দেয় মজিদকে! এবার তার ডাক শুনে একে-একে তারা ভিড় থেকে খসে এলো।

মতিগঞ্জের সড়কে ওঠে ফিরতিমুখো পথ দিয়ে মজিদ একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে থুথু ফেলে, তওবা কেটে, নি:শ্বাসের নিচে শয়তানকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করলো, তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগলো। সঙ্গের লোকেরা কিন্তু কিছু বললে না। তারা যদিও মজিদকে অনুসরণ করে বাড়ি ফিরে চলেছে কিন্তু মন তাদের দোটানার দ্বন্দ্বে দোল খায়। চোখে তাদের এখনো অশ্রুর শুষ্ক রেখা।

সে-রাত্রে ব্যাপারীকে নিয়ে এক জরুরী বৈঠক বসলো। সবাই এসে জমলে, মজিদ সকলের পানে কয়েকবার তাকালো। তার চোখ জ্বলছে একটা জ্বালাময়ী অথচ পবিত্র ক্রোধে। শয়তানকে ধ্বংস করে মূর্খ, বিপথ চালিত মানুষদের রক্ষা করার কল্যাণকর বাসনায় সমস্ত সত্তা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে।

মজিদ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সংক্ষেপে তার বক্তব্য পেশ করলো—ভাই সকলরা সকলে অবগত আছেন, যে, বে'দাতি কোন কিছু খোদাতা'লার অপ্রিয়, এবং সেই থেকে সত্যিকার মানুষ যারা তাদেরকে তিনি দূরে থাকতে বলেছেন। এ-কথাও

তারা জানে যে, শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করবার জন্য মনোমুগ্ধকর রূপ ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত কৌশলসহকারে তাকে বিপথে চালিত করবার প্রয়াস পায়। শয়তানের সে-রূপ যতই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, খোদার পথে যারা চলাচল করে তাদের পক্ষে সে-মুখোশ চিনে ফেলতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না। তাছাড়া শয়তানের প্রচেষ্টা যতই নিপুণ হোক না কেন, একটি দুর্বলতার জন্য তার সমস্ত কারসাজি ভণ্ডুল হয়ে যায়। তা হলো বে'দাতি কাজকারবারের প্রতি শয়তানের প্রচণ্ড লোভ। এখানে এ-কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, শয়তান যদি মানুষকে খোদার পথেই নিয়ে গেলো, তাহলে তার শয়তানি রইলো কোথায়।

ভনিতার পর মজিদ আসল কথায় আসে। একটু দম নিয়ে সে আবার তার বক্তব্য শুরু করে। —আউয়ালপুরে তথাকথিত যে-পীর সাহেবের আগমন ঘটেছে তার কার্যকলাপ মনোযোগ নিয়ে লক্ষ্য করলে উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। মুখোশ তাঁর ঠিক-ই আছে যে মুখোশকে ভুল করে মানুষ তার কবলে পড়বে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য মানুষকে বিপথে নেয়া, খোদার পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে চালিত করা। সে-উদ্দেশ্য তথাকথিত পীরটি কৌশলে চরিতার্থ কবার চেষ্টায় আছেন। পাঁচওক্ত নামাজের জন্য খোদা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু একটা ভুয়ো কথা বলে তিনি এতগুলো ভালো মানুষের নামাজ প্রতিদিন মকরুহ্ করে দিচ্ছেন। তাঁর চক্রান্তে পড়ে কত মুসল্লি ইমানদার মানুষ—যাঁরা জীবনে একটিবার নামাজ ক্বাজা করেননি—তাঁরা খোদার কাছে গুণাহ্ করছেন।

এ পর্যন্ত বলে বিস্ময়াহত স্তব্ধ লোকগুলোর পানে মজিদ কতক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর আরো কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাড়িতে হাত বুলায়।

গলা কেশে এবার খালেক ব্যাপারী বৈঠকের পানে তাকিয়ে বাজখাই গলায় প্রশ্ন করে, হুনলেন তো ভাই সকল?

সাব্যস্ত হলো, অন্তত, এ-গ্রামের কোন মানুষ পীর সাহেবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।

এরপর মহব্বতনগরের লোক আওয়ালপুরে একেবারে গেলো যে না, তা নয়। কিন্তু গেলো অন্য মতলবে। পরদিন দুপুরেই একদল যুবক মজিদকে না জানিয়ে একটা জেহাদি জোশে বলীয়ান হয়ে পীর সাহেবের সভায় গিয়ে উপস্থিত হলো। এবং পরে তারা বড় সড়কটার উত্তর দিকে না গিয়ে গেলো দক্ষিণ দিকে করিমগঞ্জে। করিমগঞ্জে একটি হাসপাতাল আছে।

অপরাহ্নে সংবাদ পেয়ে মজিদ ক্যানভাসের জুতো পরে ছাতি বগলে করিমগঞ্জে গেলো। হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে শয়তান ও খোদার কাজের তারতম্য আরো বিশদভাবে বুঝিয়ে বললো, বেহেস্ত ও দোজখের জলজ্যান্ত বর্ণনাও করলো কতক্ষণ।

কালু মিঃা গোঙায়। চোখে তার বেদনার পানি। সে বলে শয়তানের চেলারা তার মাথাটা ফাটিয়ে দু-ফাঁক করে দিয়েছে। মজিদ তাকিয়ে দেখে মস্ত ব্যান্ডেজ তার মাথায়। দেখে সে মাথা নাড়ে, দাড়িতে হাত বুলায়, তারপর দুনিয়া যে মস্ত বড় পরীক্ষা-ক্ষেত্র তা মধুর সুললিত কণ্ঠে বুঝিয়ে বলে। কালু মিয়া শোনে কি-না কে জানে, একঘেয়ে সুরে গোঙাতে থাকে।

রাতে এশার নামাজ পড়ে বিদায় নিতে মজিদ হঠাৎ অন্তরে কেমন বিস্ময়কর ভাব বোধ করে। কম্পাউন্ডারকে ডাক্তার মনে করে, বলে, —পোলাগুলিরে একটু দেখবেন। ওরা বড় ছোয়াবের কাম করছে। ওদের যত্ন নিলে আপনারও ছোয়াব হইব। ভাঙ্গ-গাঁজা খাওয়া রসকষশুন্য হাড়গিলে চেহারা কম্পাউন্ডারের। প্রথম দুটো পয়সার লোভে তার চোখ চকচক করে ওঠেছিল, কিন্তু ছোয়াবের কথা শুনে একবার আপাদনমস্তক মজিদকে দেখে নেয়। তারপর নিরুত্তরে হাতের শিশিটা ঝাঁকতে ঝাঁকছে অন্যত্র চলে যায়।

গ্রামে ফিরে মজিদ কালু মিঃার বাপের সঙ্গে দু-চারটে কথা কয়। বুড়ো এক ছিলিম তামাক এনে দেয়। মজিদ নিজে গিয়ে ছেলেকে দেখে এসেছে বলে কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছলছল করে। হুকা তুলে নেবার আগে মজিদ বলে,

—কোন চিন্তা করবানা মিঃা। খোদা ভরসা। তারপর বলে যে হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে সে নিজেই বলে এসেছে, ওদের যেন আদরযত্ন হয়। ডাক্তারকে অবশ্য কথাটা বলার কোন প্রয়োজন ছিলো না, কারণ, গিয়ে দেখে, এমনিতেই শাহি কাণ্ডকারখানা। ওষুধপত্র বা সেবা শুশ্রুষার শেষ নাই। খুব জোরে দম কষে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে আরো শোনায় যে, তবু তার কথা শুনে ডাক্তার বসেন, তিনি দেখবেন ওদের যেন অযত্ন বা তকলিফ না হয়। তারপর আরেকটা কথার

লেজুড় লাগায়। কথাটা অবশ্য মিথ্যে; এবং সজ্ঞানে সুস্থ দেহে মিথ্যে কথা কয় বলে মনে-মনে তওবা কাটে। কিন্তু কী করা যায়। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা। সময়-অসময়ে মিথ্যে কথা না বললে নয়।

বলে, ডাক্তার সাহেব তার মুরিদ কিনা তাই সেখানে মজিদের বড় খাতির।

শব্দার্থ ও টীকা

লোকে-লোকারণ্য – অনেক লোক। **কালো মাথার সমুদ্র** – অনেক লোকের মাথা এক দৃষ্টিতে কালো সমুদ্রের মত দেখায়। **ব্যাহত** – বাধাপ্রাপ্ত। **জন সমুদ্রের উত্তাপ** – অনেক মানুষ এক সঙ্গে থাকতে জায়গাটা গরম হয়ে ওঠেছে। **দফায় দফায়** – কিছুক্ষণ পর পর। **সর্বজনবিদিত** – সকলের জানা। **মূর্তিবৎ** – মূর্তির মতো। **বয়েত** – শ্লোক। **পাখা সঞ্চালন** – পাখা চালনা বা নাড়ানো। **ভাবমত্ততা** – ভাবের পাগলামি। **সাবলীল** – স্বচ্ছন্দ। **দ্রুত বিস্তার** – তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যাওয়া। **মরা কান্না** – কেউ মারা যাওয়ার সময় নিকট জনেরা যেভাবে কাঁদে। **জনস্রোত** – অনেক মানুষের এক সঙ্গে ধেয়ে চলা। **কাতার** – সারি, লাইন। **খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্ণ তায়** – পাগলা, বা উত্তেজিত কুকুর যে রকম তীক্ষ্ণ ভাবে ডাকে। **বেদাতি** – ইসলাম ধর্মের প্রচলিত রীতিনীতির বাইরের কোন কিছু। **মস্করা** – ঠাট্টা। **চেঁচামেচি করতা কিছকা ওয়াস্তে** – কি জন্য চেঁচামেচি করছ। **জবান** – ভাষা। **পন্থা** – পথ। **বেশরিয়তি** – ইসলাম ধর্মের আইন বিরুদ্ধ। **কাহে? জ্বোহরকা নামাজ হুয়া** – কেন? জোহরের নামাজ হয়েছে। **আছলী** – পুরো, অবিকল, সঠিক। **কদম** – পদক্ষেপ। **নাগাল** – ধরা ছোঁয়া। **মুখ খিস্তি** – মুখ বিকৃত করে খারাপ কথা বলা। **তখন তোগো পীর ধইরা রাখবার পারলো না সুরুযটারে** – তখন তোদের পীর সূর্যটাকে ধরে রাখতে পারলো না? **তওবা** – মুসলমান ধর্মমতে প্রায়শ্চিত্ত। **অশ্রাব্য** – যা শোনার যোগ্য নয়। **দোটানার দ্বন্দ্বে দোল খায়** – পীর ও মজিদ ও দুইয়ের মধ্যে কাকে তারা মানবে সেই দ্বন্দ্ব তাদের মনে আসে। **জ্বালাময়ী অথচ পবিত্র ক্রোধে** – রাগের মধ্যে জ্বালা আছে, কিন্তু রাগের উদ্দেশ্য মানুষগুলোকে সুপথে আনা। **প্রলুব্ধ করবার জন্য** – লোভ দেখানোর জন্য। **মনোমুগ্ধকর** – মনকে যা মুগ্ধ করে। **কারসাজি** – কৌশল, ফন্দি। **ভণ্ডুল** – নষ্ট। **জাহান্নাম** – নরক। **চরিতার্থ** – সফল। **মকরুহ** – গর্হিত, নিষিদ্ধ। **বাজখাঁই** – উঁচু ও কর্কশ আওয়াজ। **জেহাদি জোশ** – ধর্মযুদ্ধের প্রেরণা। **তারতম্য** – পার্থক্য। **ব্যাণ্ডেজ** – Bandage, ক্ষতস্থানে লাগানোর জন্য কাপড়ের পট্টি। **কম্পাউন্ডার** – ডাক্তারের সহকারী, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী যে লোক ওষুধ তৈরি করে। **ভাঙ্গ-গাঁজা খাওয়া রস কষ শূন্য হাড়গিলে চেহারা** – গাঁজা ভাঙ ইত্যাদি নেশা খেলে মানুষের চেহারা খুব বিশ্রী হয়ে যায়। **শাহি কাণ্ডকারখানা** – বিরাট আয়োজন। **তকলিফ** – কষ্ট। **লেজুড়** – লেজ।

পাঠসংক্ষেপ

মজিদ দুপুরের পরে আওয়ালপুরে গিয়ে পৌঁছে দেখে, অসংখ্য লোক। সবাই পীর সাহেবকে দেখতে ও তার ওয়াজ শুনতে এসেছে। মতলুব মিয়া হুজুরের গুণ বর্ণনা করতে বলে, তাঁর ক্ষমতা এত বেশি যে তিনি সূর্যকেও ধরে রাখতে পারেন। পীর সাহেবের ওয়াজ শুনে লোকজন ভাবে বিগলিত হয়ে যায়। ভক্তজনের উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি গাছের ডালে ওঠে পড়েন। এতে লোকজন আরো বিচলিত হয়ে পড়ে। লোকজনের কান্নাকাটিতে তিনি অবশেষে গাছ থেকে নামেন। ততক্ষণে বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে। পীর সাহেবের লোকেরা জোহরের নামাজ পড়ার জন্য সবাইকে কাতারে দাঁড়াতে বলে। মজিদ এতক্ষণ এসব কাণ্ড দেখছিল। এবার সে চীৎকার করে প্রতিবাদ জানায়। পীরের লোকেরা লাঠি দিয়ে মেপেও জোহরের নামাজের সময় বের করতে পারে না। মজিদ তখন মুখ খিস্তি করে পীরের ক্ষমতা নিয়ে কটাক্ষ করে। আর মহব্বতনগরের লোকদের নিয়ে ফিরে আসে। মজিদ গ্রামের লোকজনকে বুঝায় যে, পীর সাহেব মানুষকে বিপথে নিচ্ছে। মহব্বতনগরের লোকজন দলবদ্ধ হয়ে পীরের আস্তানায় হামলা করতে গিয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে যায়। খবর শুনে মজিদ তাদের দেখে আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মজিদ আওয়ালপুরে কেন গেল?
২. পীর তখন কী করছিল? মতলুব আলী পীরের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে কী বলেছিল?
৩. পীর ফারসি বয়াতে কী বলেছিল? ভক্তের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পীর কী করেছিল?
৪. মজিদ কোন্ ব্যাপারে প্রতিবাদ করল? এতে কী ফল হল?
৫. মজিদ গ্রামের লোকদের কী কথা বলল?
৬. যে সব নতুন শব্দ ও বাক্যাংশ আপনি শিখলেন সেগুলো লিখে রাখুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : মজিদ আওয়ালপুরে কেন গেল?

উত্তর : মজিদ আওয়ালপুরে গেল পীরের কারসাজি ধরিয়ে দেয়ার জন্য। বিশেষ করে মহব্বতনগরের লোকদের ফিরিয়ে আনতে না পারলে তার অসুবিধা হবে। কেননা এরাই তাকে মান্যগণ্য করেছে। এদেরকে যেভাবে হোক বোঝাতে হবে। পীর সম্বন্ধে এদের মোহ দূর করতে হবে।

প্রশ্ন : পীর তখন কী করছিল? মতলুব আলী পীরের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে কী বলেছিল?

উত্তর : মজিদ আওয়ালপুরে পৌঁছে বহু লোকের ভিড়ের সামনে পীরকে দেখতে পায়। পীর তখন একটি বটগাছের তলায় বসা। একটি লোক মস্ত এক পাখা নিয়ে তাকে হাওয়া করছে। পীর দফায় দফায় ওয়াজ করছেন।

পীরের মুরিদ মতলুব মিয়া পীরের গুণপনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। ইচ্ছে করলে তিনি সূর্যকেও এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন। যেমন, সূর্যকে ধরে রেখে পীর যখন ইচ্ছা জোহরের নামাজ পড়তে পারেন।

প্রশ্ন : মজিদ কোন্ ব্যাপারে প্রতিবাদ করল? এতে কী ফল হল?

উত্তর : জোহরের নামাজের সময় বহুক্ষণ আগে পার হওয়ার পরও পীর সাহেবের নির্দেশে এক লোক সবাইকে কাতারবন্দী হতে বলে। নামাজ শেষ হওয়ার পরে মজিদ চীৎকার করে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, জোহরের নামাজের সময় বহু আগে পার হয়েছে। পীরের লোকেরা লাঠি দিয়ে সূর্যের ছায়া মেপে দেখে মজিদের কথা ঠিক। মজিদ তখন মহব্বতনগরের লোকদের তার সঙ্গে ফিরে আসার জন্য বলে। লোকজনও তার সঙ্গে চলে আসে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

যেন বিশাল সূর্যোদয় হয়েছে, আর সে-আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

প্রদত্ত অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে আওয়ালপুরের পীর সাহেবের সঙ্গে মজিদের তুলনা করা হয়েছে।

মজিদ ধর্মকে ব্যবহার করে মহব্বতনগরের লোকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু সেই লোকজনই আওয়ালপুরে এক পীর এসেছে শুনে দলে দলে তাঁর কাছে গিয়েছে। অর্থাৎ তারা মজিদের চেয়ে ঐ পীর সাহেবকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বাস্তবে তার প্রমাণও পাওয়া গেল। মজিদ আওয়ালপুরে গিয়ে দেখে মহব্বতনগরের বহু লোকও বিশাল ভিড়ের মধ্যে আছে। এরা মজিদকে চেনে, কিন্তু আজ কেউ মজিদকে রক্ষ্য করছে না। সকলের লক্ষ্য ঐ পীর সাহেব। পীর গুণে মানে মজিদের চেয়ে অনেক বড়। পীর যেন সূর্য, অন্যদিকে মজিদ হল ক্ষুদ্র প্রদীপ। সূর্যের প্রখর আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তেমনি পীরের কাছে মজিদ আজ্ঞান।

দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা। সময়-অসময়ে মিথ্যে কথা না বললে নয়।

এ অংশটি নেয়া হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে। এখানে মজিদের এক বিশেষ উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে।

মজিদ যখন আওয়ালপুরের পীর সাহেবের শয়তানি ব্যাখ্যা করে বোঝাল তখন মহব্বতনগরের লোকেরা স্থির করল তারা ঐ পীর সাহেবের ত্রিসীমানায় আর যাবে না। অতি উৎসাহী হয়ে কিছু জোয়ান পরদিন পীরের আস্তানায় হাঙ্গামা করতে এসে পীরের চেলাদের হাতে প্রচণ্ড ঠাঙ্গানি খেল এবং স্বভাবতই গুরুতর আহতদের যেতে হল হাসপাতালে। খবর শুনে মজিদ তাদের দেখতে গেল। মজিদের সঙ্গে কম্পাউন্ডারের কথা হয়েছিল মাত্র। কম্পাউন্ডার তাকে পাত্তাও দেয়নি। মজিদ কিন্তু ফিরে এসে আহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বলল সে বড় ডাক্তারকে বলে এসেছে। বিরাট হাসপাতালের ডাক্তার তাকে খাতির যত্ন করেছে এবং রোগীদের ভালো করে দেখবে বলেছে। এ ডাক্তার তার মুরিদ। অবলীলায় সে মিথ্যা কথা বলতে পারল। অথচ তার মতো লোকের পক্ষে মিথ্যা কথা বলা একেবারেই অকল্পনীয়। কিন্তু মজিদ জানে সবাইকে খুশি করতে হল সম্ভব-অসম্ভব অসত্য কথা বলতে হয়। কেননা তাকে দুনিয়াতে টিকে থাকতে হবে। সেজন্য সে বলছে দুনিয়া বড় বিচিত্র জায়গা।

ইউনিট ৫

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আমেনা বিবির সমস্যা সম্পর্কে একটি বিবরণ লিখতে পারবেন।
- আমেনা বিবির জন্য পীর সাহেবের পানি পড়া নিয়ে আসা সম্পর্কিত ঘটনাটি বিবৃত করতে পারবেন।

☞	মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন।

মূলপাঠ

বাইরে নিরুদ্বিগ্ন ও সচ্ছন্দ থাকলেও ভেতরে-ভেতরে মজিদের মন ক-দিন ধরে চিন্তায় ঘুরপাক খায়। আওয়ালপুরে যে-পীর সাহেব আস্তানা গেড়েছে তিনি সোজা লোক নন। বহু-পুরুষ আগে দীর্ঘ পথশ্রম স্বীকার করে আবক্ষ দাড়ি নিয়ে শানদার জোব্বাজুব্বা পরে যে-লোকটি এদেশে আসেন, তাঁর রক্ত ভাটির দেশের মেঘ পানিতেও একেবারে আ-নোনা হয়ে যায়নি। পান্‌সা হয়ে গিয়ে থাকলেও পীর সাহেবের শরীরে সে-ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসী ব্যক্তিরই রক্ত। কাজেই একটা পাল্টা জবাবের অস্বস্তিকর প্রত্যাশায় থাকে মজিদ। মহব্বতনগরের লোকেরা আর ওদিকে যায় না। কাজেই, আক্রমণ যদি একান্ত আসেই আগে-ভাগে তার হদিশ পাবার জো নেই। সে জন্য মজিদের মনে অস্বস্তিটা রাত দিন আরো খচখচ করে।

মজিদ ও-তরফ থেকে কিছু একটা আশা করলে কি হবে, তিনগ্রাম ডিঙিয়ে মহব্বতনগরে এসে হামলা করার কোন খেয়াল পীর সাহেবের মনে ছিলো না। তার প্রধান কারণ তাঁর জঈফ অবস্থা। এ-বয়সে দাঙ্গাবাজি হৈ-হাঙ্গামা আর ভালো লাগে না। সাগরেদদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে প্রধান মুরিদ মতলুব খাঁ, একটা জঙ্গী ভাব দেখালেও হুজুরের নিস্পৃহতা দেখে শেষ পর্যন্ত তারা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পীর সাহেব অপরিসীম উদারতা দেখিয়ে বলেন, কুত্তা তোমাকে কামড়ালে তুমিও কি উল্‌টো তাকে কামড়ে দেবে? যুক্তি উপলব্ধি করে সাগরেদরা নিরস্ত হয়। তবু স্থির করে যে, মজিদ কিংবা তার চেলারা যদি কেউ এধারে আসে তবে একহাত দেখে নেয়া যাবে। সেদিন কালুদের কল্লা যে ধড় থেকে আলাদা করতে পারেনি, সে-জন্য মনে প্রবল আফসোস হয়।

গ্রামের একটি ব্যক্তি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করে না। সে অন্দরের লোক, আর তার তাগিদটা প্রায় বাঁচা-মরার মত জোরালো। পীর সাহেবের সাহায্যের তার একান্ত প্রয়োজন। না হলে জীবন শেষ পর্যন্ত বিফলে যায়।

সে হলো খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের বিবি আমেনা। নিঃসন্তান মানুষ। তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিলো, আজ তিরিশ পেরিয়ে গেছে। শূন্য কোল নিয়ে হা-হুতাশের সঙ্গে বুক বেঁধে তবু থাকা যেতো, কিন্তু চোখের সামনে সতীন তানু বিবিকে ফি-বৎসর আস্ত-আস্ত সন্তানের জন্ম দিতে দেখে বড় বিবির আর সহ্য হয় না। দেখা-সওয়ার একটা সীমা আছে, যা পেরিয়ে গেলে তার একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আওয়ালপুরে পীর সাহেবের আগমন-সংবাদ পাওয়া অবধি আমেনা বিবি মনে একটা আশা পোষণ করছিলো যে, এবার হয়তো বা একটা বিহিত করা যাবে। আগামী বছর তানু বিবির কোলে যখন নোতুন এক আগন্তুক ট্যাঁ-ট্যাঁ করে উঠবে তখন সেও কণ্ঠ কাতর করে বলতে পারবে, তার গা-টা কেমন-কেমন করছে, বুক ঠেলে কেবল যেন বমি আসতে চায়। তখন নানি-বুড়ির ডাক পড়বে। শেষে নানি-বুড়ি মাথা নেড়ে হেসে রসিকতা করে বলবে, ওস্তাদের মার শেষকাটালে। যৌবনের দিক থেকে সে তানু বিবির মত জোয়ারলাগা ভরগাঙ না হলেও একেবারে টস্‌কানো নয়, বোচা-চ্যাবকা কালো মানুষও নয়। রঙে ছ্যাতা

পড়বার উপক্রম করলেও এখনো সে-রঙ ধবধব করে; নাকে সতীনের মত জ্বলজ্বলে নাকছাবি না থাকলেও তা খাড়া, টিকলো। তার সন্তান আকাশের চাঁদের মত সুন্দর হবেই।

কিন্তু মুশ্‌কিল হলো কথাটা পাড়া নিয়ে। প্রথমত, ব্যাপারীকে নিরালা পাওয়া দুষ্কর। দ্বিতীয়ত, চোখের পলকের জন্য পেলেও তখন আবার জিহ্বা নড়ে না। ফিকিরফন্দি করতে-করতে এদিকে মজিদ কাণ্ডটা করে বসলো। কিন্তু আমেনা বিবি মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুযোগটা ছাড়া যায় না। সারা জীবন যে-মেয়েলোকের সন্তান হয়নি, পীর সাহেবের পানিপড়া খেয়ে সে-ও কোলে ছেলে পেয়েছে।

একদিন লজ্জা-শরমের বালাই ছেড়ে আমেনা বিবি বলেই বসে, পীর সা'বের থিকা একটু পানিপড়া আইনা দেন না।

শুনে অবাক হয় ব্যাপারী। নিটোল স্বাস্থ্য বিবির, কোনদিন জ্বরজ্বারি, পেট কামড়ানি পর্যন্ত হয় না।

আমেনা বিবি লজ্জা পেয়ে আলগোছে ঘোমটা টেনে সেটি আরো দীর্ঘতর করে, আর তার মনের কথা ব্যাপারী যেন বিনা উত্তরেই বোঝে, —তাই দোয়া করে মনে মনে।

উত্তর পায় না বলেই ব্যাপারী বোঝে। তারপর বলে, —আইচ্ছা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যে, পীর সাহেবের ত্রিসীমানায় আর তো ঘেঁষা যায় না। অবশ্য পীর সাহেবকে মজিদ খোদ ইবলিশ শয়তান বলে ঘোষণা করলেও তবু বউ-এর খাতিরে পানিপড়ার জন্য তাঁর কাছে যেতে বাধতো না, কারণ পীর নামের এমন মাহাত্ম্যযে, শয়তান ডেকেও সে-নামকে অন্তরে-অন্তরে লেবাসমুক্ত করা যায় না। গাভুর-চাষা-মাঠাইলরা পারলেও অন্তত বিস্তর জমিজমার মালিক খালেক ব্যাপারী তা পারে না। কিন্তু সাধারণ লোকে যেটা সচ্ছন্দে করতে পারে সেটা আবার তার দ্বারা সম্ভব নয়। তা হলো শয়তানকে শয়তান ডেকে সমাজের সামনে ভরদুপুরে তাকে আবার পীর ডাকা এবং সমাজের মূল হলো একটি লোক—যার আঙুলের ইশারায় গ্রাম ওঠে-বসে, সাদাকে কালো বলে, আসমানকে জমিন বলে। সে হলো মজিদ। জীবনস্রোতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারী কী করে এমন খাপে-খাপে মিলে গেছে যে, অজান্তে অনিচ্ছায়ও দুজনের পক্ষে উল্‌টো পথে যাওয়া সম্ভব নয়। এক জনের আছে মাজার, আরেক জনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।

সে-জন্য সে ভাবিত হয়, দু-দিন আমেনা বিবি কান্নাসজল কণ্ঠের আকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে। অবশেষে-বিবির কাতর দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরেই হয়তো একটা উপায় ঠাহর করে ব্যাপারী।

ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর এক ভাই থাকে। নাম ধলামিঞা। বোকা কিছিমের মানুষ, পরের বাড়িতে নির্বিবাদে খায়-দায় ঘুমায়, আর বোন-জামাইয়ের ভাত এতই মিঠা লাগে যে, নড়ার নাম করে না বছরান্তেও। আড়ালে-আড়ালে থাকে। কচিৎ কখনো দেখা হয়ে গেলে দুটি কথা হয় কী হয় না, কোনদিন মেজাজ ভালো থাকলে ব্যাপারী হয়তো-বা শালার সঙ্গে খানিক মস্করাও করে।

তাকে ডেকে ব্যাপারী বললে : একটা কাম করেন ধলামিঞা।

ব্যাপারীর সামনে বসে কথা কইতে হলে চরম অশ্বস্তি বোধ করে সে। কেমন একটা পালাই-পালাই ভাব তাকে অস্থির করে রাখে। কোনমতে বলে,

—কী কাম দুলামিঞা?

কী তার কাজ ব্যাপারী আগাগোড়া বুঝিয়ে বলে। আগে প্রথমে বিবির দিলের খায়েশের কথা দীর্ঘ ভনিতা সহকারে বর্ণনা করে। তারপর বলে, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, এবং আওয়ালপুর তাকে রওনা হতে হবে শেষরাতের অন্ধকারে—যাতে কাকপক্ষীও খবর না পায়। আর সেখানে গিয়ে তাকে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এ-গ্রামে থেকে গেছে এ-কথা ঘুণাক্ষরেও বলতে পারবে না। বলবে যে, করিমগঞ্জের ওপারে তার বাড়ি। বড় বিপদে পড়ে এসেছে পীর সাহেবের দোয়া পানির জন্য। তার এক নিকটতম নিঃসন্তান আত্মীয়ার একটা ছেলের জন্য বড় সখ হয়েছে। সখের চেয়েও যেটা বড় কথা, সেটা হলো এ যে, শেষপর্যন্ত কোন ছেলে-পুলে যদি না-ই হয় তবে বংশে বাতি জ্বালাবার আর কেউ থাকবে না। মোট কথা, ব্যাপারটা এমন করুণভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, শুনে পীর সাহেবের মন গলে যেন পানি হয়ে যায়।

বিবির বড় ভাই, কাজেই রেস্তায় মুরুব্বি। তবু ধমকে-ধামকে কথা বলে ব্যাপারী। পরগাছা মুরুব্বিকে আবার সম্মান, তার সঙ্গে আবার কেতাদুরস্ত কথা।

—কি গো ধলামিঞা, বুঝলান নি আমার কথাডা?

—জি, বুঝছি। কাঁধ পর্যন্ত ঘাড় কাৎ করে ধলামিঞা জবাব দেয়। প্রস্তাব শুনে মনে মনে কিন্তু ভাবিত হয়। ভাবনার মধ্যে এ যে, আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপথে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ পড়ে এবং সবাই জানে যে সেটা সাধারণ গাছ নয়, দস্তুরমত দেবংশি।

কাকপক্ষী যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন অনেক রাত। অত রাতে কি একাকী ঐ তেঁতুল গাছের সন্নিকটে ঘেঁষা যায়? ভাবনার মধ্যে এও ছিলো যে, যে-সব দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা শুনেছে, তারপর কোন সাহসে পা দেয় মতলুব খাঁর গ্রামে। তেঁতুল গাছের ফাড়াটা কাটলেও ঐখানে গিয়ে পীর সাহেবের দজ্জাল সাঙ্গ-পাঙ্গদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া নেহাৎ সহজ হবে না। নিজের পরিচয় নিশ্চয়ই সে লুকোবার চেষ্টা করবে, কিন্তু ধরা পড়ে যাবে না, কী বিশ্বাস! কে কখন চিনে ফেলে কিছু ঠিক নেই। যে ঢেঙা লম্বা ধলা মিঞা।

—ভাবেন কী? হুমকি দিয়ে ব্যাপারী প্রশ্ন করে।

—জি, কিছু না!

তবু কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে ব্যাপারী বলে,

—আরেক কথা। কথাডা যানি আপনার বইনে না হুনে। আপনারে আমি বিশ্বাস করলাম।

—তা করবার পারেন।

সারাদিন ধলামিঞা ভাবে, ভাবে। ভাবতে-ভাবতে ধলামিঞার কালামিঞা বনে যাবার যোগাড়। বিকেলের দিকে কিন্তু একটা বুদ্ধি গজায়। ব্যাপারীর অনুপস্থিতির সুযোগে বাইরের ঘরে বসে নলের হুকায় টান দিচ্ছিলো, হঠাৎ সেটা নাবিয়ে রেখে সে সরাসরি বাইরে চলে যায়। তারপর দীর্ঘ দীর্ঘ পা ফেলে হাঁটতে থাকে মোদাচ্ছের পীরের মাজারের দিকে। হাঁটার ঢঙ দেখে পথে দু-চারজন লোক থ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়—তার ভ্রুক্ষেপ নেই।

বাইরেই দেখা হয় মজিদের সঙ্গে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছে। কাছে গিয়ে গলা নীচু করে সে বললে,

—আপনার লগে একটু কথা আছিল।

গলাটা বিনয়ে নম্র হলেও উত্তেজনায় কাঁপছে।

খালেক ব্যাপারী তখন যে-দীর্ঘ ভনিতাসহকারে আমেনা বিবির মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিলো, তারই ওপর রঙ ফলিয়ে, এখানে-সেখানে দরদের ফোঁটা ছিটিয়ে, এবং ফেনিয়ে ফুলিয়ে দীর্ঘতর করে ধলামিঞা কথা পাড়ে। বলে, মেয়েমানুষের মন, বড় অবুঝ। নইলে সাক্ষাৎ ইবলিশ শয়তান জেনেও তারই পানিপড়া খাবার সাধ জাগবে কেন আমেনা বিবির? কিন্তু মেয়েমানুষ যখন পুরুষের গলা জড়িয়ে ধরে তখন আর নিস্তার থাকে না। খালেক ব্যাপারী আর কী করে। ধলা মিঞাকে ডেকে বলে দিলে, আওয়ালপুরে গিয়ে পীরসাহেবটির কাছ থেকে সে যেন পানিপড়া নিয়ে আসে।

মজিদ নীরবে শোনে। হঠাৎ তার মুখে ছায়া পড়ে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। তারপর সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

—তা কখন যাইবেন আওয়ালপুর?

ধলামিঞা হঠাৎ ফিচ্‌কি দিয়ে হাসে।

—আওয়ালপুর গেলে কী আর আপনার কাছে আহি? কী কেলা পানি পড়াডা দিব হে লোকটা? বেচারির মনে মনে যখন একটা ইচ্ছা ধরছে তখন ফাঁকির কাম কী ঠিক হইব? — আমি কই, আপনেই দেন পানিপড়াডা—আর কথাডা একদম চাইপা যান।

অনেকক্ষণ মজিদ চুপ হয়ে থাকে। এর মধ্যে মুখে ছায়া আসে, যায়! তার পানে চেয়ে আর তার দীর্ঘ নীরবতা দেখে ধলামিঞার সব উত্তেজনা শীতল হয়ে আসে। অবশেষে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে,

—কী কন?

—কী আর কমু এ সব কাম কী চাপাচাপি দিয়া হয়। এ কী আইন-আদালত না মামলা মকদ্দমা? দলিল-দস্তাবেজ জাল হয়, কিন্তু খোদাতা'লার কালাম জাল হয় না। আপনে আওয়ালপুরেই যান।

মুহূর্তে ধলামিঞার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে ভয়ে। রাতের অন্ধকারে দেবংশি তেঁতুল গাছটা কী যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, ভাবতেই বুকের রক্ত শীতল হয়ে আসে। তাছাড়া পীর সাহেবের ডান্ডাবাজ চেলাদের কথা ভাবলেও গলা শুকিয়ে আসে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হয়তো ভয়টাকে হজম করে নিয়ে ভগ্নগলায় ধলামিঞা বলে,

—আপনে না দিলে না দিলেন। কিন্তু হেই পীরের কাছে আমি যামু না।

—যাইবেন না ক্যান? এবার একটু রুষ্ট স্বরে মজিদ বলে, ব্যাপারী মিঞা যখন পাঠাইতেছেন তখন যাইবেন না ক্যান?

উক্তিটা দুইদিকে কাটে। কোনটা নিয়ে কোনটা ফেলে ঠিক করতে না পেরে ধলামিঞা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। অবশেষে কথাটার সঠিক মমার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা ছেড়ে সরাসরি বলে,

—হেই কথা আমি বুঝি না। কাইল সকালে এক বোতল পানি দিয়া যামু নে, আপনি পইড়া দিবেন।

ধলামিঞার মতলব, শেষরাতে উঠে গ্রামের বাইরে কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে, দুপুরের দিকে ফিরে এসে মজিদের কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে যাবে। আর পীর সাহেবের খেদমতে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যাপারী যে-টাকা দিবে তার অর্ধেক বেমালুম পকেটস্থ করে বাকিটা মজিদকে দেবে। মজিদ প্রায় ঘরের লোক। ব্যাপারীর কাছে তার দাবি-দাওয়া নেই। দিলেও চলে, না দিলেও চলে। তবু কথাটা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে হলে মজিদের মুখকেও চাপা দিতে হয়।

—তাইলে পাকাপাকি কথা হইল। ভরদুপুরে আমি আসুমনে পানি পড়া নিবার জন্য। তারপর তাড়াতাড়ি বলে, ঠগের পিছনে বেহুদা টাকা ঢালন কী বিবেক বিবেচনার কাম?

টাকার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট এবং লোভনীয় বটে। কিন্তু তবু মজিদ তার কথায় অটল থাকে। নিমরাজিও হয় না। কঠিন গলায় বলে,

—না, আপনে আওয়ালপুরেই যান।

এতক্ষণ পর ধলামিঞা বোঝে যে, মজিদের কথাটা রাগের। বিবির খাতিরে ব্যাপারী মজিদের নির্দেশের বরখেলাফ ক'রে সে-ঠক-পীরের কাছেই লোক পাঠাবে পড়াপানি আনবার জন্য—সেটা তার পছন্দসই নয়। না হবারই কথা। ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মত।

ধলামিঞা ভারিমুখ নিয়ে প্রস্থান করে। ঘরে ফিরে আবার ভাবতে শুরু করে। কিন্তু কোন বুদ্ধি ঠাহর করবার আগেই মজিদ এসে উপস্থিত হয় ব্যাপারীর বৈঠকখানায়।

শব্দার্থ ও টীকা

আস্তানা – স্থান। **আবক্ষ** – বুক পর্যন্ত। **শানদার** – উজ্জ্বল, জৌলুশপূর্ণ। **জোব্বা জুব্বা** – জোব্বা ও জুব্বা একই অর্থবোধক শব্দ। এর অর্থ লম্বা আলখাল্লা জাতীয় ঢিলে জামা। **ভাটির দেশ** – নদী বিধৌত অঞ্চল, বাংলাদেশ অর্থে। **অস্বস্তিকর** – অশান্তি পূর্ণ। **হদিশ** – সংবাদ, খবর। **জো** – উপায়। **খচখচ** – অস্বস্তির ভাব। **হামলা** – আক্রমণ। **জঈফ** – অতি বৃদ্ধ, শক্তিহীন। **দাঙ্গাবাজি** – মারপিট। **সাকরেদ** – শিষ্য। **নিরস্ত** – ক্ষান্ত। **নিস্পৃহতা** – ইচ্ছার অভাব। **কল্লা** – মাথা। **ধড়** – শরীর। **আফসোস** – অনুতাপ, দুঃখ। **অন্দর** – ভিতর বাড়ি। **ফি-বৎসর** – প্রত্যেক বৎসর। **নানি বুড়ি** – নানি দাদী জাতীয় গ্রাম্য ধাত্রী। **টসকানো** – দুমড়ানো। **ছ্যাতা** – ছত্রাক, ময়লা দাগ। **নাকছাবি** – নাকের অলংকার। **টিকলো** – তীক্ষ্ণ । **আলগোছে** – আস্তে করে। **ফিকির ফন্দি** – কৌশল, বুদ্ধি। **খোদ** – স্বয়ং, নিজেই। **ইবলিশ** – প্রধান শয়তানের নাম। **লেবাস মুক্ত** – পোশাকহীন। **নিরালা** – একলা, নির্জনে। **পলক** – অতি সামান্য সময়, চোখের পাতা পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ। **ত্রিসীমানায়** – কাছে কিনারে। **সাহায্য** – মর্যাদা। **গাভুর** – চাকর, শ্রমিক। **মাঠাইল** – মাঠচাষী। **প্রতিপত্তি** – ক্ষমতা, দাপট। **একাট্টা** – এক সঙ্গে যুক্ত। **ঠাহর** – অনুমান, খোঁজ। **কিছিম** – ধরন। **নির্বিবাদে** – শান্তিতে। **মস্করা** – ঠাট্টা। **খায়েশ** – ইচ্ছা। **ভনিতা** – ভূমিকা। **রেস্তা** – সম্পর্ক, আত্মীয়তা। **দেবংশি** – দেও-দানবের অংশ, ভুতের আশ্রয়। **সন্নিকটে** – কাছে। **দজ্জাল** – দুষ্ট, অত্যাচারী। **নিস্তার** – অব্যাহতি। **ফিচকি দিয়ে হাসা** – দুষ্টের মতো হাসা। **সন্দিগ্ধ** – সন্দেহযুক্ত। **কালাম** – বাণী। **চেলা** – শিষ্য। **মমার্থ** – মূল কথা। **মতলব** – উদ্দেশ্য **উপলব্ধি করা** – বোঝা। **খেদমতে** – সেবায়। **বেমালুম** – অগোচরে, অজ্ঞাতে। **বেহুদা** – অকারণে। **নিমরাজি** – অর্ধেক রাজি। **বরখেলাফ** – অমান্য। **ভারি মুখ** – বেজার, অখুশি মুখ।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যের অর্থ

উপন্যাসকে জীবনধর্মী করার জন্য চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার হয়। 'লালসালু' একটি বাস্তব জীবনধর্মী উপন্যাস, সে জন্য এ উপন্যাসেও আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ হয়েছে। আপনি 'লালসালু' উপন্যাসের আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি ভালো করে দেখুন এবং বুঝতে চেষ্টা করুন।

'লালসালু' উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা সবাই গ্রামের, সুতরাং এটা স্বাভাবিক। ওয়ালীউল্লাহ তাঁর লালসালু' উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার চমৎকার ব্যবহার করেছেন। মজিদ মাজারের খাদেম এবং একজন মোল্লা। তার মুখের কথা মোল্লা-মৌলবীর মতো হয়েছে; এতে মাঝে মাঝে আরবি ফারসি শব্দের মিশেল আছে। গ্রামের অন্যান্য চরিত্রের সংলাপও যথাযথ হয়েছে। 'লালসালু' উপন্যাসের আঞ্চলিক ভাষা বাংলাদেশের কোন্ অঞ্চলের ভাষা সে প্রশ্ন করা যায়। আমাদের মনে হয, ঢাকা অঞ্চলের ভাষার আদল এতে আছে। এ-ভাষার ক্রিয়াপদের রূপ প্রায় ক্ষেত্রে অপিনিহিতজাত, - যেমন 'পরে'র বদলে পইড়া, 'করে'র বদলে 'কইরা',, 'কেঁদে কেটে' হয় 'কাইন্দা কাইটা', এ ছাড়া রয়েছে 'করতে'র বদলে 'করবার', নেওয়ার বদলে নিবার, যাবো'র পরিবর্তে 'যামু, 'স'র জায়গায় 'হ', যেমন 'সেই'-এর বদলে 'যেই', শুনি হয় হুনি, সর্বনাম 'তিনি' ও তাঁর 'তানি' ও 'তানার' আমাদের বদলে 'আমাগো, নির্দেশক টা ও টি যথাক্রমে 'ডা' ও 'ডি'- যেমন কথাটা 'কথাডা, ছোটটি ছোডডি প্রশ্নবোধক কেন হয় ক্যান, অব্যয় যেন ও থেকে হয় 'যানি' ও থিকা ইত্যাদি। আঞ্চলিক শব্দ তো আছেই, যেমন ছেলে অর্থে 'ছ্যামরা', শরীর অর্থে 'শরীল' আঞ্চলিক কথ্যবুলি উচ্চারণের টানটুনে বেশি স্পষ্ট হয়। আঞ্চলিক শব্দ, বাকরীতি ও উচ্চারণের স্বাতন্ত্য মিলিয়ে আঞ্চলিক ভাষার রূপ ফুটে ওঠে। আপনারা 'লালসালু'র আঞ্চলিক ভাষারীতি লক্ষ্য করুন।

শেষকাটালে – শেষ সময়ে।

থিকা – থেকে।

আইনা – এনে।

ক্যান – কেন।

আইচ্ছা – আচ্ছা।

কাম – কাজ।

দুলামিঞা – বোনের স্বামী, জামাই।

বুঝলান নি – বুঝলেন কি।

কথাডা – কথাটা।

যানি – যেন।

বইনে – বোনে।

হুনে – শোনে।

করবার – করতে।

লগে – সঙ্গে।

আছিল – ছিল।

আহি – আসি।

কেলা – কলা (তুচ্ছার্থে)।

চাইপা – চেপে, গোপন করে।

জী কন – কি বলেন।

কী আর কমু – কি আর বলব।

চাপাচাপি – গোপন করে।

হেই পীরের কাছে আমি যামু না – সেই পীরের কাছে আমি যাব না।

পইড়া – পড়ে।

আসুম – আসব।

বাগধারা

ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া – রাগ বা উত্তেজনা কমানো

এক হাত দেখে নেওয়া – প্রতিশোধ নেওয়া।

শূন্য কোল – সন্তানহীন

বুক বেঁধে থাকা – ধৈর্য ধরে থাকা

ওস্তাদের মার – কুশলী ব্যক্তির নৈপুণ্য

জোয়ার লাগা ভরা গাঙ পরিপূর্ণ যৌবন

কথা পাড়া – বিষয় উত্থাপন করা

মরিয়া হয়ে ওঠা – বেপরোয়া ভাব

লজ্জা-শরমের বালাই – লজ্জার বোধ।

ভর দুপুরে – ঠিক দুপুর বেলায়

খাপে খাপে মেলা – সম্পর্ণ রূপে মিলে যাওয়া

পালাই-পালাই ভাব – পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে

কাক পক্ষীও খবর না পায় – কেউ যাতে টের না পায়, সকলের অজ্ঞাতে

ঘুণাক্ষরে – আভাসে ইঙ্গিতে

বংশে বাতি জ্বালা – বংশ রক্ষা করা

মন গলে পানি হওয়া – দয়ালু হওয়া

পরগাছা – যে অন্যের খেয়ে বাঁচে

কেতা দুরস্ত – ফিটফাট

ফাড়া কাটা – বিপদ দূর হওয়া

ধরা পড়ে যাওয়া – পরিচয় প্রকাশ পাওয়া

বুদ্ধি গজানো – বুদ্ধির জন্ম

থ হওয়া – হতবাক হওয়া, বিস্মিত হওয়া

রঙ ফলানোর বাড়িয়ে বলা

মুখে ছায়া পড়া – বিরক্তিতে কিংবা চিন্তায় মুখ অপ্রসন্ন হওয়া

বুকের রক্ত শীতল হওয়া – অতিরিক্ত ভয় পাওয়া

গলা শুকানো – ভীত হওয়া

গা ঢাকা দেয়া – লুকিয়ে থাকা

ধামাচাপা দিয়ে রাখা – গোপন করা

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া – ওপরওয়ালাকে অগ্রাহ্য করে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা।

ব্যাকরণ

বাংলা শব্দ তৈরির একটা উপায় হল সমাস। সমাসের সাহায্যে দীর্ঘ কথাকে এক শব্দে পরিণত করা যায়। এতে ভাষার সৌন্দর্য বাড়ে। আলোচ্য পাঠে এ রকম কিছু সমাসবদ্ধ শব্দ আছে। এ-শব্দগুলো এবং এগুলোর ব্যাখ্যামূলক বাক্য (ব্যাস বাক্য) ভালো করে দেখে নিন।

নিরুদ্বিগ্ন – নিঃ(নয়) উদ্বিগ্ন

আবক্ষ – বক্ষ পর্যন্ত

আ-নোনা – আ(নয়) নোনা

অস্বস্তি – স্বস্তির অভাব

ভাগ্যান্বেষী – ভাগ্য অন্বেষণ করে যে

বাঁচা মরা – বাঁচা ও মরা

ফি-বৎসর – বৎসর বৎসর

ভরা গাঙ – ভরা যে গাঙ

কান্না সজল – কান্নায় সহজ

আগাগোড়া – আগা থেকে গোড়া

দেবংশি – দেব অংশ যার

দলিল-দস্তাবেজ – দলিল ও দস্তাবেজ

আইন-আদালত – আইন ও আদালত

মামলা-মোকদ্দমা – মামলা ও মোকদ্দমা

নিমরাজি – অর্ধেক রাজি

ঠক-পীর – ঠক যে পীর

পাঠসংক্ষেপ

মজিদের মনের ভিতরে ভয় থাকলেও আওয়ালপুরের বুড়ো পীর সাহেবের কাছ থেকে পাল্টা হামলা হয়নি। খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আমেনা বিবি নিঃসন্তান। সন্তান লাভের কামনায় সে স্বামীকে অনুরোধ করে ঐ পীর সাহেবের কাছ থেকে পানি পড়া আনতে। মজিদ এর আগে পীর সাহেবের কাছে যেতে সবাইকে মানা করে দিয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর খাতিরে ব্যাপারী তার সম্বন্ধী ধলা মিঞাকে আওয়ালপুর থেকে রাতে গোপনে পীরের পানি পড়া আনতে বলে। ধলা মিয়া মুখে রাজি হলেও ভূতের ভয়ে আওয়ালপুরে যায় না। সে মজিদের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলে এবং মজিদকে অনুরোধ করে পানি পড়া দিতে। এ পানি পড়া সে পীরের পানি পড়া হিসেবে চালিয়ে দেবে। মজিদ পানি পড়া দিতে মোটেও রাজি হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মজিদের মনে অস্বস্তি কেন?
২. পীর সাহেব মহব্বত নগরে হামলা করতে চায়নি কেন?
৩. মহব্বত নগরের কোন্ লোক পীর সাহেবের সাহায্য চায় এবং কেন?

৪. ধলামিঞা কে? খালেক ব্যাপারী তাকে কি করতে বলল?
৫. ধলা মিঞা আওয়ালপুরে যেতে চায় না কেন?
৬. ধলা মিঞার মনে কী মতলব ছিল?
৭. মজিদ ধলা মিঞার প্রস্তাবে রাজি হয়নি কেন?
৮. বাক্যে নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশগুলোর যথাযথ প্রয়োগ করুন।

এক হাত দেখে নেওয়া, ওস্তাদের মার, ঘুণাক্ষরে, কেতাদুরস্ত, গা ঢাকা দেয়া, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : মজিদের মনে অস্বস্তি কেন?

উত্তর : মজিদ কিছুদিন আগে আওয়ালপুরের পীর সাহেবেকে ইবলিশ শয়তান বলে গালাগাল করেছে। সে মহব্বত নগরের লোকদের বুঝিয়েছে যে, এ পীর আসলে ভণ্ড এবং বিপথগামী। মজিদের বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহব্বত নগরের কিছু যুবক পীরের আস্তানায় গিয়ে হামলাও করেছে। হামলা করতে গিয়ে নিজেরাও জখম হয়েছে। মজিদ আশঙ্কা করে পীরে সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা এ হামলার বদলা নেবে। তারা নিশ্চয়ই প্রস্তুতি নিচ্ছে। অথচ কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সেজন্য মজিদের মনে রাত-দিন অস্বস্তি জেগে রয়েছে।

প্রশ্ন : পীর সাহেব মহব্বত নগরে হামলা করতে চায় নি কেন?

উত্তর : আওয়ালপুর থেকে মহব্বতনগর অনেকটা দূর, প্রায় তিন গ্রাম ব্যবধান। এতে দূরে এসে হামলা করা তেমন সুবিধার হবে বলে পীর সাহেব মনে করেননি। তাছাড়া তাঁর বয়সও হয়েছে অনেক। তিনি এখন জরাক্রান্ত ও দুর্বল, যৌবনের তেজ নেই। এ-বয়সে দাঙ্গা-হাঙ্গামা তাঁর পছন্দের নয়। সে জন্য মহব্বত নগরে হামলা করতে তিনি উৎসাহ দেখান নি।

প্রশ্ন : মহব্বত নগরের কোন্ লোক পীর সাহেবের সাহায্য প্রার্থী এবং কেন?

উত্তর : মহব্বতনগর গ্রামের প্রতিপত্তিশালী জোতদার খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আমেনা বিবি পীর সাহেবের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী। আমেনা বন্ধ্যা নারী। ব্যাপারীর সঙ্গে বহুদিন ঘর করছে সে, কিন্তু তার কোনো সন্তান হচ্ছে না। তের বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল, এখন তিরিশ। অন্য দিকে আমেনা বিবির সতীন তানু বিবির সন্তান হচ্ছে প্রত্যেক বৎসর। আমেনা বিবির বিশ্বাস, পীর সাহেবের পানি পড়া খেলে সে সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হবে। সে শুনেছে, যে মেয়ে লোকের সারা জীবন সন্তান হয়নি সেও পীরের পানি পড়া খেয়ে ছেলের মা হয়েছে। সে জন্য আমেনা পীরের দোয়া চায়।

প্রশ্ন : ধলা মিঞা আওয়ালপুরে যেতে চায় না কেন?

উত্তর : খালেক ব্যাপারী তাঁর সম্বন্ধী ধলা মিঞাকে আমেনা বিবির জন্য আওয়ালপুর থেকে গোপনে পীর সাহেবের পানি পড়া আনতে বলে। পানি পড়া নিতে তাকে আওয়ালপুর থেকে যাত্র শুরু করতে হবে শেষ রাতে, যাতে ভোর হওয়ার আগেই ধলামিঞা মহব্বত নগরে ফিরে আসতে পারে এবং এ ব্যাপারে কেউ যেন টের না পায়। কিন্তু ধলা মিঞা আওয়ালপুরে যেতে চায় না। আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপথের তেঁতুল গাছের তলা দিয়ে রাতের বেলা আসতে সে ভীষণ ভয় পায়। কারণ তেঁতুলগাছটি দেবংশি অর্থাৎ এগাছ ভুত প্রেতের আস্তানা। তা ছাড়া পীর সাহেবের সাঙ্গোপাঙ্গোদের হাতে মার খাওয়ার ভয়ও তার ছিল।

প্রশ্ন : ধলা মিঞার মনে কী মতলব ছিল ?

উত্তর : ধলা মিঞা তেঁতুল গাছ ও পীরের চেলাদের ঠ্যাঙ্গানি খাওয়ার ভয়ে আওয়ালপুরে যেতে চায় না। সে মজিদের কাছ থেকে গোপনে পানি পড়া নেওয়ার মতলব করে। এ পানি পড়াকে সে পীর সাহেবের পানি পড়া হিসেবে চালাবে। মনে মনে সে স্থির করে, শেষ রাতে উঠে সে গ্রামের বাইরে কোথায়ও লুকিয়ে থাকবে, দুপুরে সুযোগ বুঝে সে মজিদের কাছ থেকে পানি পড়া চেয়ে নেবে। আর খালেক ব্যাপারী পীর সাহেবের জন্য যে টাকা দিয়েছে তার অর্ধেকটা মজিদকে দেবে, বাকি টাকা সে আত্মাৎ করবে।

প্রশ্ন : মজিদ ধলা মিঞার প্রস্তাবে রাজি হয়নি কেন?

উত্তর : ধলা মিঞার কাছ থেকে সব কথা জেনে মজিদ খুব রেগে যায়। সে মহব্বত নগরের প্রধান তার নিষেধ সত্ত্বেও আমেনা বিবি ও খালেক ব্যাপারী কেন আওয়ালপুরের পীর সাহেবের কাছ থেকে পানি পড়া আনতে চায় তা মজিদের রাগের কারণ। তাছাড়া মহব্বতনগরের সবাই তাকেই পীর হিসেবে জানে। সে ক্ষেত্রে আমেনা বিবি তার ওপর বিশ্বাস রাখল না কেন? এ সব প্রশ্ন মজিদকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। সে জন্য ধলা মিঞার প্রস্তাবে সে পানি পড়া দিতে রাজি হয়নি।

প্রশ্ন : বাক্যে নিম্নলিখিত বাগ্‌ধারাগুলো ব্যবহার করুন

মরিয়া হয়ে ওঠা, বুক বেঁধে থাকা, ফাড়া কাটা, বংশে বাতি জালানো, থ হওয়া।

উত্তর

মরিয়া হয়ে ওঠা – প্রথম পুরস্কার পাওয়ার জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বুক বেঁধে থাকা – ছেলেরা মানুষ হবে- এ আশায় স্বামী-স্ত্রী বুক বেঁধে আছে।

ফাড়া কাটা – যাক, এবারের মত ফাড়াটা কাটল।

বংশে বাতি জ্বালান – আবার বংশে বাতি জ্বালানোর কেউ নেই; আমি মরলেই সব শেষ।

থ হওয়া – এক রত্তি ছেলের কাণ্ড দেখে থ হতে হল।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. সে অন্দরের লোক, আর তার তাগিদটা বাঁচা-মরার মত জোরালো।

২. দেখা-সওয়ার একটা সীমা আছে, যা পেরিয়ে গেলে তার একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

৩. এক জনের আছে মাজার, আরেক জনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি।

৪. সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।

৫. ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মত।

নমুনা উত্তর

সে অন্দরের লোক গো, ... মত জোরালো।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে আমেনা বিবির জন্য পীর সাহেবের পানিপড়া আনার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

আমেনা বিবি মহব্বত নগর গ্রামের মাতব্বর খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে সে সন্তানের মুখ দেখতে পায়নি। ওদিকে তার সতীন তানু বিবির প্রতি বছর বাচ্চা হচ্ছে। সন্তানহীনা আমেনা বিবির মনে বড় দুঃখ। নিজেকে বড় অপূর্ণ মনে হয় তার। সন্তানের জন্ম দিতে না পারলে নারীর জীবনে সার্থকতা থাকে না। আর সন্ত ান না থাকলে বেঁচে থেকেই বা লাভ কি? সে জন্য আমেনা বিবি এ-বয়সেও সন্তান লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আওয়ালপুরে এক পীর সাহেব এসেছেন জেনে সে খুব খুশি হয়। কিন্তু মজিদ এ পীরকে ভণ্ড শয়তান ও বিপথগামী আখ্যা দিয়েছে। মহব্বতনগরের সব মানুষকে সে পীরের কাছে যেতে মানা করেছে। মজিদের লোকেরা গিয়ে পীরের আস্তানায় দাঙ্গাও করেছে। কিন্তু এ সব কাণ্ড আমেনা বিবি মোটেও পছন্দ করে নি। সন্তান লাভ করতে হলে পীরের সাহায্য চাই। পীরের পানি পড়া খেলেই তার ইহজীবনের দুঃখ ঘুচে যাবে, সে সন্তানবতী হতে পারবে। আমেনা বিবির কাছে পীরের গুরুত্ব সেজন্য এত বেশি।

সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা পথ তাদের এক।

ব্যাখ্যেয় অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে মহব্বতনগরের দুই শক্তিশালী মানুষ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

এ দুই শক্তিমান পুরুষ হল মজিদ ও খালেক ব্যাপারী। এরা একে অন্যের পরিপূরক। তবে মজিদের শক্তি খালেক ব্যাপারীর চেয়ে বেশি। খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনা বিবি সন্তান লাভের জন্য আওয়ালপুরের পীর সাহেবের পানি পড়া খেতে চায়। কিন্তু মজিদ পীর বিরোধী। মজিদ সিদ্ধান্ত দিয়েছে, পীরের ত্রিসীমানায় কেউ ঘেষবে না। এখন বিবির জন্য পানিপড়া আনতে গেলে মজিদের নির্দেশের বরখেলাফ হয়। খালেক ব্যাপারী বিস্তর জমিজমার মানুষ এবং সে গ্রামের মাতব্বরও। মজিদকে তোয়াক্কা না করলেও সে পারে। কিন্তু ব্যাপারী জানে মজিদ হল সমাজের মূল, তার কথায় সমাজ উঠে বসে। মজিদের শক্তির উৎস সালু কাপড়ে আবৃত মাজার। এ মাজারের প্রতি মানুষের ভয়-বিশ্বাস ও ভক্তি রয়েছে। খালেক ব্যাপারী সে জন্য মজিদকে চটায় না। অন্যদিকে মজিদেরও প্রয়োজন খালেক ব্যাপারীকে। এ গ্রামে ব্যাপারীই সবচেয়ে বেশি বিষয়-আশয়ের মালিক। তাকে হাতে রাখা খুবই প্রয়োজন। এতে গ্রামের সব লোক মজিদকে মান্য করবে। এ বিচারে বলা যায় মজিদ আর খালেক ব্যাপারী একই পথের পথিক। দুজনেরই মূল লক্ষ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ন রাখা।

ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মত।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া। এখানে মজিদকে উপেক্ষা করে আওয়ালপুরের পীর সাহেবের কাছ থেকে পানি পড়া আনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

খালেক ব্যাপারীর নিঃসন্তান স্ত্রী আমেনা বিবি সন্তানের জন্য পীর সাহেবের পানিপড়া খেতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে সে স্বামীকে অনুরোধ করে। কিন্তু ব্যাপারীর হয়েছে বিপদ। মহব্বতনগরে সবচাইতে প্রতাপশালী লোক হল মজিদ। মজিদ সবাইকে পীরের ধারে কাছে ঘেষঁতে মানা করে দিয়েছে। তানু বিবির খাতিরে খালেক ব্যাপারী তার সম্বন্ধী ধলা মিঞাকে গোপনে পানিপড়া আনতে বলে। ভূতের ভয়ে ধলা মিঞা আওয়ালপুরে না গিয়ে মজিদের কাছে পানিপড়া নিতে আসে। মজিদ কিন্তু বেঁকে বসে। মজিদই এ গ্রামের ধর্মগুরু, সে মাজারের খাদেম। তাকে উপেক্ষা করে এবং তার কথা না শুনে ঠক পীরের কাছ থেকে পানিপড়া আনার জন্য লোক পাঠানো ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মতো। মজিদ এ জন্য খুব রাগ করে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- আমেনা বিবির সন্তানলাভের উপায় হিসেবে মজিদের মতলবের একটি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

যতক্ষণ নোতুন এক ছিলিম তামাক সাজানো হয় কল্কিতে, ততক্ষণ দু-জনে গরু-ছাগলের কথা কয়। দুয়েক বাড়িতে গরুর ব্যারামের কথা শোনা যাচ্ছে। মজিদের ধামড়া গাইটা পেট ফুলে ঢোল হয়ে আছে। রহীমা কত চেষ্টা করছে কিন্তু গাইটা দানা-পানি নিচ্ছে না মুখে। খাচ্ছেও না কিছু, দুধও দিচ্ছে না এক ফোঁটা।

তামাক এলে কতক্ষণ নীরবে ধুমপান করে মজিদ। তারপর এক সময় মুখ তুলে প্রশ্ন করে,

–হেই পীরের বাচ্চা পীর শয়তানের খবর কী? এহনো ঈমানদার মানুষের সর্বনাশ করতাছে না সট্‌কাইছে?

প্রশ্ন শুনে খালেক ব্যাপারী ঈষৎ চমকে ওঠে, তারপর তার চোখের পাতায় নাচুনি ধরে। চোখ অনেক কারণেই নাচে। তাই শুধু নাচলেই ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। কিন্তু ব্যাপারীর মনে হয়, তামাক-ধোয়ার পশ্চাতে মজিদের চোখ হঠাৎ

অস্বাভাবিকভাবে তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে এবং সে-চোখ দিয়ে সে তার মনের কথা কেতাবের অক্ষরগুলোর মত আগাগোড়া অনায়াসে পড়ে ফেলছে।

–কী জানি, কইবার পারি না। অবশেষে ব্যাপারী উত্তর দেয়। কিন্তু আওয়াজ শুনে মনে হয় গলাটা যেন ধ্বসে গেছে হঠাৎ। সজোরে একবার কেশে নিয়ে বলে, হয়তো গেছে গিয়া।

মজিদ আস্তে বলে,

–তাইলে আর তানার কাছে লোক পাঠাইয়া কী করবেন?

–লোক পাঠামু তানার কাছে? বিস্ময়ে ব্যাপারী ফেটে পড়ে। কিন্তু মজিদের শীতল চোখদুটোর পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে বোঝে যে, মিথ্যা কথা বলা বৃথা। শুধু বৃথা নয়, চেষ্টা করলে ব্যাপারটা বড় বিসদৃশও দেখাবে। যে করেই হোক, মজিদ খবরটা জেনেছে।

একবার সজোরে কেশে ধ্বসে যাওয়া গলাকে অপেক্ষাকৃত চাঙা করে তুলে ব্যাপারী বলে,

–হেই কথা আমি ভাবতাছি। আছে কী না আছে –হুদাহুদি পাঠান। তবু মেয়েমানুষের মন। সতীন আছে ঘরে। ক্যামনে কখন দিলে চোট পায় ডর লাগে। তা যাক। পাইলে পাইল, না পাইলে নাই। আসলে মন-বোঝান আর কী। ঠগ-পীরের পানিপড়ায় কী কোন কাম হয়?

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ব্যাপারী ধীরে ধীরে সব বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে। বলে, মজিদকে সে-বলে-বলে করেও বলতে পারেনি। আসল কথা তার সাহস হয়নি, পাছে মজিদ মনে ধরে কিছু। কথাটা মজিদের যে পছন্দ হয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সে হুকায় জোর টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে চোখ গম্ভীর করে তোলে। ব্যাপারীর মত বিস্তর জমিজমার মালিক ও প্রতিপত্তিশালী লোক তাকে ভয় পায়–শুনে পুলকিত হবারই কথা। ব্যাপারী আরো বলে যে, ধলামিঞাকে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে–ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন বুঝতে না পারে সে মহব্বতনগরের লোক। তাছাড়া, এ-গ্রামের কেউ যেন তাকে আওয়ালপুর যেতে না দেখে, কারণ তাহলে মজিদের নির্দেশের বরখেলাপ করা হয় খোলাখুলিভাবে।

ধলামিঞারে যতটা বেকুফ ভাবছিলাম, ব্যাপারী বলে, ততটা বেকুফ হে না। হে ভাবছে ভুয়া পানি আইনা ফায়দা কী। তানার যখন একটা ছেলের সখ হইছেই–

মজিদ বাধা দেয়। ধলামিঞার গুণচর্চায় তার আকর্ষণ নেই। হঠাৎ মধুর হাসি হেসে বলে,

–খালি আমার দুঃখডা এই যে, আপনার বিবি আমারে একবার কইয়াও দেখলেন না। আমার থিকা ঠগ-পীর বেশি হইল? আমার মুখে কী জোর নাই?

–আহা-হা , মনে নিবেন না কিছু। মেয়েমানুষের মন। দূর থিকা যা হোনে তাতেই ঢলে।

–কথাডা ঠিক কইছেন। মজিদ মাথা নেড়ে স্বীকার করে। তারপর বলে, তয় কথা কি, তাগো কথা হুনলে পুরুষ থাকে না, মেয়েমানুষেরও অধম হয়। তাগো কথা হুনলে কি দুনিয়া চলে?

ব্যাপারীর মস্ত গোঁফে আর ঘন দাড়িতে পাক ধরেছে। মজিদের কথায় সে গভীরভাবে লজ্জা পায়। তখনকার মত মজিদের ভঙ্গিতেই বলে,

–ঠিকই কইছেন কথাডা। কিন্তু কি করি এহন । কাইন্দাকাইটা ধরছে বিবি।

–তানারে কন, পেটে যে বেড়ি পড়ছে হে বেড়ি না খোলন পর্যন্ত পোলাপাইনের আশা নাই। শয়তানের পানিপড়া খাইয়া কি হে-বেড়ি খুলবো?

পেটে বেড়ি পড়ার কথা সম্পর্ণ নোতুন শোনায়। শুনে ব্যাপারীর চোখ হঠাৎ কৌতূহলে ভরে ওঠে। সে ভাবে, বেড়ি, কিসের বেড়ি?

মজিদ হাসে। ব্যাপারীর অজ্ঞতা দেখেই তার হাসি পায়। তারপর বলে,

–পেটে বেড়ি পড়ে বইলাই তো স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয় না। কারো পড়ে সাত প্যাঁচ, কারো চোদ্দ। একুশ বেড়িও দেখছি একটা। তয় সাতের উপরে হইলে ছাড়ান যায় না। আমার বিবির তো চোদ্দ প্যাঁচ!

ব্যাপারী উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—আমার বিবিরডা ছাড়ান যায় না?

—ক্যান যায় না? তয় কথা হইতেছে, আগে দেখন লাগবো কয় প্যাঁচ তানার। কথাটা শুনে ব্যাপারী আবার না ভাবে যে মজিদ তার স্ত্রীর উদরাঞ্চল নগ্নদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে—তাই তাড়াতাড়ি বলে, এর একটা উপায় আছে।

উপায়টা কী, বলে মজিদ। একদিন সেহ্‌রী না খেয়ে আমেনা বিবিকে রোজা রাখতে হবে। সেদিন কারো সঙ্গে কথা কইতে পারবে না এবং শুদ্ধচিত্তে সারাদিন কোরান শরীফ পড়তে হবে। সন্ধ্যার দিকে এফতার না করে মাজার শরীফে আসতে হবে। সেখানে মজিদ বিশেষ ধরনের দোয়া দরুদ পড়ে একটা পড়াপানি তৈরি করে তাকে পান করতে দেবে। তারপর আমেনা বিবিকে মাজারের চারপাশে সাতবার ঘুরতে হবে।

যদি সাত প্যাঁচ হয় তবে সাত পাক দেবার পরই হঠাৎ তার পেট ব্যথায় টনটন করে উঠবে। ব্যাথাটা এমন হবে যে, মনে হবে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে।

ব্যাপারী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—আর সাত পাকে যদি ব্যথা না ওঠে?

—তয় বুঝতে হইব যে, তানার চোদ্দ প্যাঁচ কী আরো বেশি। সাত প্যাঁচ হইলে দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

তারপর মজিদ আবার গরুছাগলের কথা পাড়ে। এক সময় আড়-চোখে ব্যাপারীর পানে তাকিয়ে দেখে, গৃহপালিত জীবজন্তুর ব্যারামের কথায় তেমন মনোযোগ যেন নেই তার। আরো দু-চারটে অসংলগ্ন কথার পর মজিদ উঠে পড়ে।

শব্দার্থ ও টীকা

ছিলিম – এক কল্কে তামাক। **ব্যারাম** – অসুখ। **দানাপানি** – খাদ্য। **ঈমানদার** – বিশ্বাসী। **ঘাবড়াবার** – ভয় পাওয়ার। **মনের কথা পড়া** – ভিতরে কি আছে তা জেনে ফেলা। **গলা ধ্বসে যাওয়া** – গলা দিয়ে শব্দ না আসা। **বিসদৃশ** – উল্টাপাল্টা। **চাঙ্গা** – সজীব। **দিল** – মন। **চোট** – আঘাত। **ডর** – ভয়। **পুলকিত** – আনন্দিত। **ধাক্কা সামলানো** – স্বাভাবিক হওয়া। **মনে ধরা** – মনে কষ্ট পাওয়া। **প্রতিপত্তিশালী** – শক্তিমান। **গুণচর্চা** – গুণের প্রশংসা। **ঢলে** – ঝোঁকে, বিশ্বাস করে। **বিস্তারিত** – খোলাখুলি। **পাক ধরেছে** – পেকে উঠছে। **বেকুফ** – বোকা। **ভুয়া** – মিথ্যে। **ফায়দা** – লাভ। **বেড়ি** – বেষ্টনি, বন্ধনি। **কৌতূহল** – জানার আগ্রহ। **উৎকণ্ঠিত** – চিন্তিত, ব্যাকুল। **উদরাঞ্চল** – পেট। **নগ্ন দৃষ্টি** – খোলা চোখ। **সেহেরী** – রোজা রাখার জন্য শেষ রাতের খাবার। **শুদ্ধচিত্তে** – পবিত্র মনে। **প্রসব বেদনা** – বাচ্চা হওয়ার বেদনা। **এফতার** – রোজা ভাঙার জন্য খাবার। **অসংলগ্ন** – এলোমেলো।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্য

করতাছে – করছে

সট্‌কাইছে – পালিয়ে গেছে

কইবার পারি না – বলতে পারি না

গেছে গিয়া – চলে গেছে

তানার – তাঁর

পাঠামু – পাঠাব

হেই কথা আমিও ভাবতাছি – সে কথা আমিও ভাবছি

হুদাহুদি – শুধু শুধু

আইনা – এনে

হে ভাবছে ভুয়া পানি আইনা ফায়দা কী – সে ভেবেছে মিথ্যে পানি এনে লাভ কি ?

কইয়াও দেখলেন না – বলেও দেখলেন না

দূর থেকে যা হোনে তাতেই চলে – দূর থেকে যা শোনে তা বিশ্বাস করে

কথাডা ঠিক কইছেন – কথাটা ঠিক বলেছেন

তাগো – তাদের

এহন – এখন

কাইন্দা কাইটা – কেঁদেকেটে

তানারে কন – তাঁকে বলুন।

খোলন – খোলা

পোলা পাইন – ছেলেপিলে, সন্তান

বইলাই – বলেই

তয় – তবে

দেখন লাগবো – দেখতে হবে।

পাঠসংক্ষেপ

মজিদ খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে যায়। কথায় কথায় ব্যাপারী এটি বুঝতে পারে যে পানি- পড়া আনার ঘটনা মজিদ জেনে গেছে। মেয়ে মানুষের মন বোঝানোর জন্য যে এককাজ করেছে এ রকম একটা ধারণা দিতে ব্যাপারী চেষ্টা করে। মজিদের দুঃখ আমেনা বিবি তার চেয়ে ঠক-পীরকে বেশি বিশ্বাস করল। মজিদ ব্যাপারীকে এক অদ্ভুত কথা শোনায়। বলে, আমেনা বিবির পেটে বেড়ি পড়েছে, সেজন্য তার সন্তান হচ্ছে না। কথাটি সে এমনভাবে বলে যাতে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। মজিদ উদ্বিগ্ন ব্যাপারীকে বেড়ি খোলার উপায়ও জানিয়ে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পানিপড়া আনার প্রসঙ্গ নিয়ে মজিদ খালেক ব্যাপারীকে কী বোঝায়?
২. 'আমার মুখে কী জোর নাই? - কথাটির তাৎপর্য কী?
৩. মজিদের মতে আমেনা বিবির সন্তান লাভের উপায় কী? বর্ণনা করুন।
৪. যে আঞ্চলিক শব্দগুলো আপনি জেনেছেন সেগুলো লিখুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : পানিপড়া আনা প্রসঙ্গে খালেক ব্যাপারী মজিদকে কি বোঝায়?

উত্তর : মজিদের কথায় খালেক ব্যাপারী বুঝে ফেলেচে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মজিদ পীরের কাছ থেকে পানিপড়া আনার পরিকল্পনা জেনে গেছে। ধরা পড়ে ব্যাপারী লজ্জিত হয় এবং সে মজিদকে বোঝাতে চায় আমেনা বিবির জন্য সে এ কাজ করেছে। মেয়েমানুষের মন বোঝা ভারি মুশকিল। তা নইলে ঠক পীরের পানিপড়ায় যে কোনো কাজ হয় না তা সে বোঝে। ব্যাপারী মজিদকে এও বোঝাতে চায় যে ধলামিঞা লোকটা তত বোকা নয়। সে মজিদের কাছে পানি পড়া চেয়েছে এ জন্য যে মজিদের পানি পড়াই খাঁটি, আর পীরের পানি পড়া ভুয়া।

প্রশ্ন : আমার মুখে কী জোর নাই? - কথাটার তাৎপর্য কী?

উক্তিটি মজিদের। আমেনা বিবি ও খালেক ব্যাপারী মজিদের চেয়ে পীর সাহেবকে বেশি মূল্য দেয়াতে মজিদ এ উক্তি করেছে। তার দুঃখ কেন আমেনা বিবি তাকে একবার বলে দেখল না। সে মাজারের খাদেম। সেও ঐশী শক্তিতে বলবান। তার কাছ থেকে কত লোকে পানিপড়া চেয়ে নিচ্ছে এবং উপকার পাচ্ছে। অথচ আমেনা বিবি তার ওপর বিশ্বাস রাখে নি। সে পীরের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় এ কথাটি সে বোঝাতে চায়। আসলে মজিদ নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তার এলাকার বাইরের লোকের কদর হবে তা সে ভাবতেই পারে না।

প্রশ্ন : মজিদের মতে আমেনা বিবির সন্তান লাভের উপায় কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর । মজিদ খালেক ব্যাপারীকে এক অদ্ভুত কথা জানায়। সে বলে আমেনা বিবির পেটে বেড়ি পড়েছে। এ বেড়ি না খুললে সন্তান লাভের আশা নেই। পেটে বেড়ি পড়ে বলেই মেয়ে লোকের সন্তান হয় না। কারো বেড়ি সাত, কারো চৌদ্দ বা তার বেশি। তবে সাতের বেশি হলে ছাড়ান যায় না। আমেনা বিবির পেটের বেড়ি খোলার উপায় জানতে চাইলে উৎকণ্ঠিত খালেক ব্যাপারীকে মজিদ একটি নিয়ম পালনের কথা বলে। তা হল একদিন সেহ্‌রী না খেয়ে আমেনা বিবিকে রোজা রাখতে হবে এবং সারাদিন কারো সঙ্গে কথা না বলে কোরান পড়তে হবে। এরপর সন্ধ্যায় এফতার না করে তাকে মাজারে আসতে হবে। তখন মজিদের দেয়া পানিপড়া খেয়ে আমেনা বিবি মাজারের চারদিকে সাতপাক দেবে। আমেনা বিবির বেড়ি যদি সাত হয় তাহলে সাতবার ঘুরলেই পেটে তীব্র বেদনা হবে। তখন বুঝতে হবে যে বেড়ি খুলে যাচ্ছে।

ব্যাখ্যা

চোখ অনেক কারণেই নাচে। তাই শুধু নাচলেই ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে। এ অংশে খালেক ব্যাপারীর মনের অবস্থা বোঝানো হয়েছে।

মজিদ ধলামিঞার কাছ থেকে পানিপড়া আনার কথা জেনে যায়। তারপর সে খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে যায় এবং আওয়ালপুরের পীরের কথা জিজ্ঞাসা করে। পীরের নাম শুনে ব্যাপারী চমকে ওঠে এবং তার চোখের পাতা নাচতে থাকে। চোখের পাতা নাচলে অমঙ্গল বা বিপদ ঘনিয়ে আসে এ-রকম একটা কুসংস্কার মানুষের মনে রয়েছে। কিন্তু সব সময় তা যে হবে এমন কথা বলা যায় না। সেজন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এভাবে চিন্তা করে ব্যাপারী মজিদের সামনে স্বাভাবিক থাকতে চেষ্টা করে।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- হাসুনির মার মায়ের মৃত্যুর খবর ও মজিদের প্রতিক্রিয়ার একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

ফেরবার পথে মোল্লা শেখের বাড়ির কাছে কাঁঠালগাছের তলে একটা মূর্তি নজরে পড়ে। মূর্তি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলো না, তাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়েছে। মগরেবের কিছু দেরি আছে, কিন্তু শীতসন্ধ্যা ধোঁয়াটে বলে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখায় সে-মূর্তি। তবু তাকে চিনতে মজিদের এক পলক দেরি হয় না। সে হাসুনির মা। মুখটা ওপাশে ঘুরিয়ে আলতোভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

নিকটবর্তী হতেই হাসুনির মা কেমন এক কান্নার ভঙ্গিতে মুখ হাতে ঢাকে। আরো কাছে গিয়ে মজিদ থমকে দাঁড়ায়, দাড়িতে হাত সঞ্চালন করে কয়েক মুহূর্ত তাকে চেয়ে দেখে। তারপর বলে,

–কী গো হাসুনির মা?

যে-কান্নার ভঙ্গিতে তখন হাতে মুখ ঢেকেছিলো সে এবার মজিদের প্রশ্নে আস্তে নাকিসুরে কেঁদে ওঠে। কান্নাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; আসল উদ্দেশ্য এই বলা যে, যা ঘটেছে তা হাসবার নয়, কান্নার ব্যাপার।

আকস্মিক উদ্বেগ বোধ করে মজিদ। মেয়েটার চলন-বলন কেমন যেন নম্র। বয়স হলেও আনাড়ি বেঠিকপানা ভাব। হাতে নিলে যেন গলে যাবে। মাস-খানেক আগে একদিন শেষরাতে খড়কুটোর উজ্জ্বল আলোয় যার নগ্ন বাহু-পিঠ-কাঁধ দেখেছিলো মজিদ, সে যেন ভিন্ন কোন মানুষ। এখন তাকে দেখে শ্বসন দ্রুততর হয় না।

কণ্ঠে দরদ মাখিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—কী হইছে তোমার বিটি?

এবার নাক ফ্যাৎ-ফ্যাৎ করে হাসুনির মা অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে,

—মা মরছে।

বজ্রাহত হবার ভান করে মজিদ। আর তার মুখ দিয়ে অভ্যাসবশত সে-কথাটাই নিঃসৃত হয়, যা আজ কতশত বছর যাবৎ কোটি কোটি খোদার বান্দারা অন্যের মৃত্যু-সংবাদ শুনে উচ্চারণ করে আসছে। তারপর বলে,

—আহা, ক্যামনে মরলো গো বিটি?

—এ্যামনে।

এমনি মারা গেছে কথাটা কেমন যেন শোনায়। পলকের মধ্যে মজিদের স্মরণ হয় তাহেরের বৃদ্ধ ঢেঙা বাপের বিচারের দৃশ্য। তার জন্য অবশ্য অনুতাপ বোধ করে না মজিদ। কেবল মনে হয় কথাটা। থেমে আবার প্রশ্ন করে,

—ছ্যামরারা কই?

—আছে। ধান বিক্রি কইরা ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে। ছোটডি কয় কেরায়া নায়ের মাঝি হইব।

—দাফন-কাফনের যোগাড়যন্ত্র করতাছে নি?

—করতাছে। মোল্লা শেখে জানাজা পড়বো।

খেলাল তুলে হঠাৎ দাঁত খোঁচাতে থাকে মজিদ, কপালে ক-টা রেখা ফোটে। তারপর চিন্তিত গলায় বলে,

—মওতের আগে খোদার কাছে মাফ চাইছিল নি তহুর মা?

ধাঁ করে হাসুনির মা মুখ ঘুরিয়ে তাকায় মজিদের পানে। দেখতে না দেখতে চোখে ভয় ঘনিয়ে ওঠে।

—মাফ চাইছিল কি না কইবার পারি না।

কয়েক মুহূর্ত মজিদ নীরব থাকে। এ-সময়ে কপালে আরো কয়েকটি রেখা ফুটে ওঠে। কিছু না বললেও হাসুনির মা বোঝে, মজিদ তার মায়ের কবরের আজাবের কথা ভাবে। মায়ের মৃত্যুতে সে তেমন কিছু শোক পেয়েছে বলা যায় না। বার্ধক্যের শেষ স্তরে কারো মৃত্যু ঘটলে দুঃখটা তেমন জোরালোভাবে বুকে লাগে না। তবে মায়ের কুঁকড়ানো রগ-ঝোলা যে-মৃত দেহটি এখনো ঘরের কোণে নিস্পন্দভাবে পড়ে আছে সে-দেহটিকে নিয়ে যখন পেছনের জঙ্গলের ধারে কদমগাছের তলে কবর দেয়া হবে, তখন হয়তো দমকা হাওয়ার মত বুকে সহসা হাহাকার জাগবে। তারপর শীঘ্র আবার মিলিয়ে যাবে যে-হাহাকার। কিন্তু তার মা নিঃসঙ্গ সে কবরে লোক-চোখের অন্তরালে অকথ্য যন্ণাভোগ করবে—এ-কথা ভাবতেই মেয়ের মন ভয়ে ও বেদনায় নীল হয়ে ওঠে। কলাপাতার মত কেঁপে উঠে সে প্রশ্ন করে,

—মায়ের কবরে আজাব হইব?

সরাসরি কথাটার উত্তর দিতে মজিদের মুখে বাধে। থেমে বলে,

—খোদা তারে বেহেস্তে-নছিব কর, আহা।

একবার আড়চোখে তাকায় হাসুনির মা-র দিকে। চোখে মরণ-ভীতির মত গাঢ় ছায়া দেখে হয়তো বা একটু দুঃখও হয়। ভাবে, তার জন্য লোকটি নিজেই দায়ী। আর যাই হোক, মজিদের কথাকে যে অবহেলা করে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চায় তাকে সে মাফ করতে পারে না।

তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করে মজিদ। বাঁ ধারে মাঠ। দিগন্তের কাছে ধূসর ছায়া দেখে মনে ভয় হয়। নামাজ ক্বাজা হবে না তো?

শব্দার্থ ও টীকা

ধোঁয়াটে – ধোঁয়ার মতো। **আলতোভাবে** – হালকাভাবে। **নিকটবর্তী** – কাছে। **সঞ্চালন** – নাড়ানো, চালানো। **আকস্মিক** – হঠাৎ। **উদ্বেগ** – দুশ্চিন্তা। **চলন-বলন** – চলাফেরা ও কথাবার্তা। **আনাড়ি** – অদক্ষ। **বেঠিকপানা** – ভুলযুক্ত। **খড়্‌কুটো** – শুকনো ঘাস। **শ্বসন** – শ্বাস প্রশ্বাস। **দরদ** – সহানুভূতি। **ফ্যাৎ-ফ্যাৎ** – নাকের শব্দ। **বজ্রাহত** – বাজ পড়েছে এমন। **ভান করা** – কৃত্রিম আচরণ করা। **আর তার ... করে আসছে** – মুসলমানেরা মৃত্যু সংবাদ শুনলে আরবি দরুদ পড়ে–ইন্নাল্লিাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। **বান্দা** – দাস। **দাফন-কাফন** – মৃত মানুষকে ধুয়ে কাপড় পরিয়ে কবর দেয়া, মৃতদেহের সৎকার। **যোগাড়যন্ত্র** – ব্যবস্থা। **জানাজা** – কবর দেয়ার আগে মৃতের জন্য নামাজ পড়া। **খেলাল** – দাঁত পরিস্কার করার চিকন কাঠি। **কেরায়া** – ভাড়া। **কেরায়া নায়ের মাঝি** – ভাড়া খাটা নৌকার মাঝি। **কপালে রেখা টোটা** – চিন্তার ভাব জাগা। **আজাব** – শাস্তি । **নিস্পন্দভাবে** – প্রাণহীনভাবে। **হাহাকার** – দুঃখ, শোক। **অন্তরালে** – আড়ালে। **নীল হয়ে ওঠা** – যন্ণার প্রকাশ। **বেহেস্ত-নছিব** – বেহেশ্‌তে যাওয়ার ভাগ্য। **খাড়া হয়ে দাঁড়ানো** – নিজের মত কাজ করা, নিজের শক্তিতে দাঁড়ানো। **দিগন্ত** – আকাশ ও মাটির মিলন রেখা। **ক্বাজা** – নামাজ যথাসময়ে না পড়া।

আঞ্চলিক

হইছে – হয়েছে।

বিটি – বেটি, কন্যা।

মা মরছে – মা মরেছে।

এ্যামনে – এমনি।

ছ্যামরারা কই – ছেলেরা কোথায়।

ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে – ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে আছে অর্থাৎ কাজ না করে আরাম আয়েশে আছে।

করতাছে নি – করছে কি?

জানাজা পড়বো – জানাজা পড়বে।

মওত – মৃত্যু।

চাইছিল – চেয়েছিল।

পাঠসংক্ষেপ

খালেক ব্যাপরীর বাড়ি থেকে ফেরার পথে হাসুনির মার সঙ্গে মজিদের দেখা হয়। হাসুনির মা তার মায়ের মৃত্যু সংবাদ জানায়। মজিদ শোকাহত হয়েছে এমন ভাব দেখায়। মজিদ হাসুনির মাকে জিজ্ঞেস করে মরার আগে তার মা আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছিল কিনা। এ ব্যাপারে হাসুনির মা নিশ্চিত নয়। মায়ের কবর আজাব হবে ভেবে তার মনোকষ্ট হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বাড়ি ফেরার পথে মজিদের সঙ্গে কার দেখা হয়েছিল? সে কাঁঠালগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল কেন?

২. "আর তার মুখ ..... করে আসছে।" – কথাটার অর্থ কী?

৩. মজিদ হাসুনির মাকে কেন জিজ্ঞাসা করল যে তার মা মরার আগে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছিল কিনা?
৪. হাসুনির মায়ের মন বেদনায় নীল হয়ে ওঠে কেন?
৫. নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশগুলোর অর্থ লিখুন :

ভান করা, কপালে রেখা ফোটা, ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে থাকা, নীল হয়ে ওঠা, খাড়া হয়ে দাঁড়ানো।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : বাড়ি ফেরার পথে ..... কেন?

উত্তর : বাড়ি ফেরার পথে হাসুনির মায়ের সঙ্গে মজিদের দেখা হয়েছিল। সে মোল্লা শেখের বাড়ির কাছে কাঁঠাল গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল। সে জেনেছে যে মজিদ খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে গেছে এবং এটিই হচ্ছে ফেরার পথ। তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছে। শোকগ্রস্ত হাসুনির মা মজিদকে এ সংবাদটি জানানোর জন্য গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

প্রশ্ন : "আর তার মুখ ..... করে আসছে।" কথাটার অর্থ কি?

উত্তর : মানুষ মরণশীল। মানুষের মৃত্যু হবেই। কারো মৃত্যু সংবাদ শুনলে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান সঙ্গে সঙ্গে বলবে- ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।" ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে মুসলমানেরা এ কথা বলে আসছে। মুসলমানদের এটিই ধর্মীয় রীতি। শত শত বৎসর ধরে এ রীতি চালু রয়েছে।

প্রশ্ন : মজিদ হাসুনির মাকে ..... মাফ চেয়েছিল কিনা ?

উত্তর : মৃত্যুর আগে মানুষ আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নেয়। দুনিয়াদারিতে মানুষ অনেক পাপ করে। মাফ চাইলে আল্লাহ সদয় হন। হাসুনির মায়ের মা মরার আগে মাফ চেয়েছিল কিনা এ প্রশ্ন মজিদ করেছে এ জন্য যে, ঐ বুড়ি স্বামীর সঙ্গে নিত্য ঝগড়া করত এবং এমন সব কথা বলত যা ছিল সম্পর্ণ অনুচিত। হাসুনির মায়ের বাপ নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ঐ বুড়ির কুৎসিত কথার কারণে। ধর্মীয় মতে, এসব কথায় আল্লাহ নারাজ হন। মাফ চাওয়ার কথাটা এসেছে এ কারণে।

প্রশ্ন : হাসুনির মায়ের মন বেদনায় নীল হয়ে ওঠে কেন?

উত্তর : হাসুনির মায়ের মা বৃদ্ধ বয়সে মারা গেছে। বুড়ো বয়সে মারা গেল শোক তেমন বেশি হয় না। মায়ের জন্য হাসুনির মারও শোক বেশি হয় নি। কিন্তু যখন সে মজিদের কথায় বোঝে যে তার মায়ের কবর আযাব হবে তখনই তার মনে হাহাকার জাগে। কবরে মায়ের একাকী যন্ণাভোগ তার দুঃখের কারণ। সেই জন্যই তার মনের মধ্যে বেদনা জেগে উঠে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

এখন তাকে দেখে শ্বসন দ্রুততর হয় না।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। হাসুনির মাকে দেখে মজিদের যে এখন কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না তা এখানে বলা হয়েছে।

মজিদ মোল্লা-মৌলবী গোছের মানুষ, সে ধর্মকর্ম নিয়ে থাকে। কিন্তু আর সকলের মতো তারও কামনা বাসনা আছে। যুবতী স্ত্রীলোক দেখলে সেও আকর্ষণ বোধ করে। মাস খানেক আগে এক রাতে ধান সিদ্ধ করার সময় বেগুনি শাড়ি পরা হাসুনির মায়ের খোলা বাহু কাঁধ ও পিঠ দেখে মজিদ তার প্রতি কামাসক্ত হয়েছিল। কিন্তু আজকে মা-মরা হাসুনির মাকে দেখে তার সেই মনোভাব জাগে না।

বার্ধক্যের শেষ স্তরে কারো মৃত্যু ঘটলে দুঃখটা তেমন জোরালোভাবে বুকে লাগে না।

এ অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। মৃত্যু শোকের মধ্যেও যে তারতম্য আছে সেটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

অল্প বয়সে কারো মৃত্যু হলে নিকট জন ও আত্মীয় স্বজনেরা খুব বেশি শোক করে। কেননা এ ব্যক্তি আরো বহুদিন বেঁচে থাকতে পারত। তার তো মরার বয়স হয়নি। এ-মৃত্যুকে ঠিক মেনে নেয়া যায় না। কিন্তু বুড়া-বুড়ির মৃত্যু হলে নিকট জনেরাও অধিক শোকাহত হয় না। কারণ তারা ধরে নিয়েছে এর মরার সময় হয়েছে। তার মৃত্যু সবাই স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়। হাসুনির মাও তার বুড়ি মায়ের মৃত্যুকে সেভাবে নিয়েছে।

ইউনিট ৬

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মাজারে যাওয়ার জন্য আমেনা বিবির প্রস্তুতি ও তার মনোভাবের কথা জানতে পারবেন।

☞	মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন।

মূলপাঠ

পরের শুক্রবার আমেনা বিবি রোজা রাখে। পীর সাহেবের পানি পড়া পাবে না জেনে প্রথমে নিরাশ হয়েছিলো; কিন্তু পেটে বেড়ির কথা শুনে এবং প্যাঁচ যদি সাতটির বেশি না হয় তবে মজিদ তার একটা বিহিত করতে পারবে শুনে শীঘ্র মন থেকে নিরাশা কেটে গিয়ে আশার সঞ্চার হলো। আস্তে-আস্তে একটা ভয়ও এলো মনে। প্যাঁচ যদি সাতের বেশি হয়, চৌদ্দ কিংবা একুশ? মজিদের নিজের বউ-এর তো সাতের বেশি। সে নাকি একুশও দেখেছে।

ব্যাপারটা গোপন রাখবে স্থির করেছিলো আমেনা বিবি কিন্তু এসব কথা হলে বাতাসে কথা শুরু করে। তানু বিবিই গল্প ছড়ায় এবং শুক্রবার সকাল থেকে নানা মেয়েলোক আসতে থাকে দেখা করতে। আমেনা বিবি কারো সঙ্গে কথা কয় না। ঘরের কোণে আবছায়ার মধ্যে মাদুরে বসে গুনগুনিয়ে কোরান শরীফ পড়ে।

মাথায় ঘোমটা, মুখটা ইতিমধ্যে দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে উঠেছে। পাড়াপড়শীরা এসে দেখে-দেখে যায়, তারপর আড়ালে তানু বিবি সঙ্গে নীচু গলায় কথা কয়। তানু বিবি অবিশ্রান্ত পান বানায় আর মেহমানদের খাওয়ায়।

দুপুরের কিছু আগে মজিদের বাড়ি থেকে রহীমা আসে। হাতে ঘষা-মাজা তামার গ্লাসে পানি। এমনি পানি নয়–পড়াপানি। মজিদ বলে পাঠিয়েছে গোসল করার আগে আমেনা বিবি পেটে পানিটা যেন ঘষে। দোয়া-দরুদ পড়া পানি, তার প্রতিটি ফোঁটা পবিত্র। কাজেই মাখবার সময় পুকুরের পানিতে দাঁড়িয়েই যেন মাখে।

রহীমা সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে যায় না। পান-সাদা খায়, তানু বিবির সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কয়। এক সময় তানু বিবি প্রশ্ন করে,

–বইন, আপনেও তো মাজারের পাশে সাত পাক দিছেন, না?

–আমি দেই নাই।

–দেন নাই? বিস্মিত হয়ে তানু বিবি বলে। –তয় তানি ক্যামনে জানলেন আপনার চৌদ্দ প্যাঁচ?

রহীমা লজ্জার হাসি হেসে বলে,

–তানি যে আমার স্বামী। স্বামী হইলে এ্যামনেই বোঝে।

তয় তানি বোঝেন না ক্যান? তানু বিবির তানি মানে খালেক ব্যাপারী।

রহীমা মুশ্‌কিলে পড়ে। দুই তানিতে যে প্রচুর তফাৎ আছে সে কথা কী করে বোঝায়। তানু বিবি একটু বোকা অথচ আবার দেমাকি কিছিমের মানুষ। স্বামী বিস্তর জমিজমার মালিক বলে ভাবে, তার তুলনায় আর কেউ নেই। শেষে রহীমা আস্তে বলে,

—তানি যে খোদার মানুষ।

আমেনা বিবিকে গোসল করিয়ে বাড়িতে ফেরে রহীমা। মজিদ উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে,

—পড়াপানিডা নাপাক জাগায় পড়ে নাই তো?

—না। যা পড়ছে তালাবের মধ্যেই পড়ছে।

সূর্য যখন দিগন্তসীমারেখার কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন জোয়ান-মদ্দ দুজন বেহারা পাল্কি এনে লাগালো অন্দর ঘরের বেড়ার পাশে।

এক ঢিলের পথ, কিন্তু ব্যাপারীর বউ হেঁটে যেতে পারে না।

ব্যাপারী হাঁকে, —কই, তৈয়ার হইছেন নি?

আমেনা বিবি আবছায়ার মধ্যে তখনো গুনগুনিয়ে কোরান শরীফ পড়ছে। দুপুরের দিকে চেহারায় তবু কিছু জৌলুষ ছিল, এখন বেলাশেষের ম্লান আলোয় একেবারে ফ্যাকাশে ঠেকে। তার চোখের সামনে আঁকাবাঁকা প্যাঁচানো অক্ষরগুলো নাচে, আবছা হয়ে গিয়ে আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ছোট হয়ে আবার হঠাৎ বড় হয়ে যায়। আর শুষ্ক ঠোঁট দুটো থেকে থেকে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে।

তানু বিবি গিয়ে ডাকে,

—ওঠ বুবু, সময় হইছে।

ডাক শুনে ফাঁসির আসামীর মত আমেনা বিবি চমকে উঠে ভীতবিহ্বল দৃষ্টিতে একবার তাকায় সতীনের পানে। তারপর ছুরা শেষ করে কোরান শরীফ বন্ধ করে, গেলাফে ভরে, শেষে পালকস্পর্শের মত আলগোছে তাতে চুমু খায়। সেটা ও রেহেল নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ তার মাথা ঘুরে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়, আর শরীরটা টাল খেয়ে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম করে। তানু বিবি ধরে ফেলে তাকে। তারপর একটু আদা-নুন মুখে দিয়ে ঘরের কোণেই মগরেবের নামাজটা আমেনা বিবি সেরে নেয়।

উঠানের পথটুকু অতিক্রম করতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করে আমেনা বিবি। পুরা ত্রিশ দিন রোজা রেখেও যে বিন্দুমাত্র কাহিল হয় না সে একদিনের রোজাতেই একেবারে ভেঙে গেছে। গায়ে-মাথায় বুটিদার হলুদ রঙের একটা চাদর দিয়েছে। সেটা বুকের কাছে চেপে ধরে গুটি-গুটি পায়ে হাঁটে। কিসের এত ভয় তাকে পিষে ধরেছে—ক-ঘণ্টায় যে ভয় দীর্ঘ রোগভোগ করা মানুষের মত তাকে দুর্বল করে ফেলেছে? এক যুগেরও ওপরে যে নিঃসন্তান থাকতে পারলো সে যদি জানে যে, ভবিষ্যতেও সে তেমনি নিঃসন্তান থাকবে, তবে এমন মুষড়ে যাবার কী আছে? এ-প্রশ্ন আমেনা বিবি তার নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করে।

তবে কথা হচ্ছে কী, তেরো বছরের কথা একদিনে জানে নি, জেনেছে ধাপে-ধাপে ধীরে-ধীরে, প্রতি বৎসরের শূন্যতা থেকে। সে-শূন্যতাও আবার পরবর্তী বছরের আশায় শীঘ্র ক্ষয়ে তেজশূন্য হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ জীবনের শূন্যতার কথা তেমনি বছরে-বছরে যদি জানে তবে আঘাতটা দীর্ঘকালব্যাপী সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে তীব্রতায় হ্রাস পাবে, মনে কিছু-বা লাগলেও গায়ে লাগবে না। কিন্তু এক মুহূর্তে সে-কথা জানলে বুক ভেঙে যাবে না, বেঁচে থাকবার তাগিদ কি হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে না?

সে-ভয়েই দু-কদমের পথ ঘাসশূন্য মসৃণ ক্ষুদ্র উঠানটা পেরুতে গিয়ে আমেনা বিবির পা চলে না; সে ভয়ের জন্যই জোর পায় না কোমরে, চোখে ঝাপসা দেখে। একবার ভাবে, ফিরে যায় ঘরে। কাজ কী জেনে ভবিষ্যতের কথা। যাই হোক, দয়ালুদের মধ্যে দয়ালুতম সে-খোদার ইচ্ছাই তো অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

কিন্তু গুটি-গুটি করে চললেও পা এগিয়ে চলে। মনের ইচ্ছায় না হলেও চলে লোকদের খাতিরে। ঢাকঢোল বাজিয়ে যোগাড়যন্ত্র করিয়ে এখন পিছিয়ে যেতে পারে না। পুরুষ হলে হয়তো-বা পারতো, মেয়েলোক হয়ে পারে না। সমাজ যাকেই ক্ষমা করুক না কেন, বিরুদ্ধ ইচ্ছা দ্বারা চালিত, দো-মনা খুশির বশের মানুষের আয়োজন ভঙ্গ করা নারীকে ক্ষমতা করে না। এ-সমাজে কোন মেয়ে আত্মহত্যা করবে বলে একবার ঘোষণা করে সে মনের ভয়ে আবার বিপরীত কথা বলতে পারে না। সমাজই আত্মহত্যার মাল-মশলা জুগিয়ে দেবে, সর্বতোভাবে সাহায্য করবে যাতে তার নিয়ত হাসিল হয়, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে তাকে আবার বাঁচতে দেবে না। মেয়েলোকের মনের মস্করা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ। এখানে তাদের বেহুদাপনার জায়গা নেই।

শব্দার্থ ও টীকা

রোজা – ইসলাম ধর্ম মতে দিনের বেলায় উপবাস। **বিহিত করা** – সমাধান করা। **সঞ্চার** – আবির্ভাব। **আবছায়া** – আলো আঁধার। **মাদুর** – পাটি। **অবিশ্রান্ত** – বিশ্রাম না নিয়ে। **মেহমান** – অতিথি। **ঘষা-মাজা** – পরিষ্কার। **দোয়া-দরুদ** – আল্লাহর মহিমা বিষয়ে পাঠ। **তফাৎ** – পার্থক্য। **বিস্তর** – অনেক। **দেমাকি** – দেমাক বা গর্ব আছে যার। **নাপাক** – অপবিত্র। **তালাব** – পুকুর। **দিগন্ত সীমারেখা** – আকাশ আর মাটি যেখানে মিশেছে মনে হয়। **বেহারা** – পাল্কি বাহক। **অন্দর ঘর** – ভিতর বাড়ি। **জৌলুষ** – উজ্জ্বলতা। **বেলা শেষের ম্লান আলো** – বিকেল বেলার নিস্তেজ আলো। **ফ্যাকাশে** – ম্লান, মলিন। **আবছা** – অস্পষ্ট। **থেকে থেকে** – একটু পর পর। **ভীত বিহ্বেল** – ভয়ে কাতর। **ছুরা** – পবিত্র কোরানের এক একটি পাঠ। **গেলাফ** – কাপড়ের আবরণ। **পালক স্পর্শ** – অতি হালকা স্পর্শ। **রেহেল** – কোরান শরীফ রাখার জন্য কাঠের কাঠামো। **টাল খেয়ে** – ঘুরে। **কাহিল** – দুর্বল। **উপক্রম** – অবস্থা। **মগরেবের নামাজ** – সান্ধ্যকালীন নামাজ। **বুটিদার** – বুটিওয়ালা/যে কাপড়ে সূচের তৈরি ফুল তোলা হয়। **গুটি গুটি পায়ে হাঁটা** – খুব আস্তে আস্তে সাবধানে হাঁটা। **মুষড়ে যাওয়া** – ভয় পাওয়া। **ধাপে ধাপে** – বিভিন্ন সময়ে। **প্রতি বৎসরের শূন্যতা** – প্রতি বৎসর সন্তান না হওয়ার অভাব। **হ্রাস** – কমা। **তাগিদ** – প্রেরণা, আশা। **ফুরিয়ে যাওয়া** – শেষ হওয়া। **দু'কদমের পথ** – অল্প দূরত্বের পথ। **মাল মশলা** – উপকরণ। **সর্বতোভাবে** – সব দিক থেকে। **বেহুদাপনা** – অকাজ। **নিয়ত** – মনের ইচ্ছা। **হাসিল** – অর্জন।

বিশিষ্টার্থক ব্যবহার

বাতাসে কথা শুরু করে – গোপন কথা অতি দ্রুত প্রকাশিত হয়।

মুখ শুকিয়ে ওঠা – মুখের স্বাভাবিকতা নষ্ট হওয়া।

সুখ দুঃখের কথা – সংসারের কথা।

এক ঢিলের পথ – অতি কাছে।

ফাঁসীর আসামী – কঠোর শাস্তি যার জন্য বরাদ্দ।

চোখ অন্ধকার হওয়া – চোখে কিছু না দেখা।

ভেঙে যাওয়া – শক্তিহীন হওয়া।

পা চলে না – হাঁটার শক্তি নেই।

অক্ষরে অক্ষরে – পুরোপুরি।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্য

বইন – বোন

আপনেও – আপনিও

দিছেন – দিয়েছেন

তানি – তিনি

যা পড়ছে তালাবের মধ্যেই পড়ছে – যা পড়েছে পুকুরের মধ্যেই পড়েছে

তৈয়ার হইছেন নি – তৈরি হয়েছেন কী?

সময় হইছে – সময় হয়েছে।

পাঠ সংক্ষেপ

শুক্রবার দিন আমেনা বিবি মজিদের নির্দেশ মতো রোজা রাখে। সারাক্ষণ কোরান শরীফ পড়ে। আমেনা বিবির ব্যাপারটি গোপন থাকে না। দুপুরে মজিদের স্ত্রী রহীমা এসে আমেনা বিবিকে পেটে মাখার জন্য পানি পড়া দিয়ে যায়। সন্ধ্যার একটু আগে আমেনা বিবির জন্য পালকি আসে। মগরেবের নামাজ সেরে আমেনা বিবি পাল্কিতে চড়ে বসে। আমেনা বিবির মনে

বেজায় ভয় ঢোকে। মাজারে যেতে তার অনিচ্ছা। তার ভয়, মাজারের চারধারে ঘুরেও যদি তার সন্তান না হয়। এ মাজারে না গিয়ে তার উপায় নেই। সমাজের ভয়েই তাকে মাজারে যেতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. যে পাঠটি পড়লেন তা নিজের ভাষায় লিখুন।

২. যে আঞ্চলিক শব্দ ও বাগার্থ আপনি জানলেন সেগুলো সাজিয়ে লিখুন।

৩. আমেনা বিবির মনে আশার সঞ্চার হল কেন?

৪. পরে মাজারে যেতে তার ভয় হল কেন?

৫. বুঝিয়ে লিখুন –

ক. কাজেই মাখবার সময় পুকুরের পানিতে দাঁড়িয়েই যেন মাখে।

খ. দুই তানিতে যে প্রচুর তফাৎ আছে সে কথা কী করে বোঝায়!

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : আমেনা বিবির মনে আশার সঞ্চার হল কেন?

উত্তর : আমেনা বিবি প্রথমে নিরাশ হয়েছিল। কারণ আওয়ালপুরের পীর সাহেবের পানি পড়া সে পায়নি। সুতরাং সে ধরেই নিয়েছিল তার আর সন্তান হবে না। কিন্তু মজিদ যখন পেটের বেড়ির কথা বলল এবং সাতের বেশি বেড়ি না থাকলে তা খোলার ব্যবস্থার কথা জানাল, তখন তার মনে আশার আলো দেখা দিল। সন্তান হওয়ার যে কোন সম্ভাবনার কথা আমেনা বিবিকে ভরসা দেয়।

প্রশ্ন : পরে মাজারে যেতে তার ভয় হল কেন?

উত্তর : আমেনা বিবিকে মাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য পালকি আসে। সন্ধ্যার পর পাল্কিতে ওঠার সময় হয়। ছোট্ট একটি উঠোন পার হতে হবে। উঠোন পার হতে গিয়ে আমেনা বিবি যেন আর হাঁটতে পারে না। তার মনের মধ্যে ভয় ঢোকে। যদি মাজারে গিয়েও তার সন্তান না হয়। তাহলে মুহূর্তেই তার আশা চুরমার হয়ে যাবে। এরকম একটা আশঙ্কায় তার মনে ভয় ঢোকে।

প্রশ্ন : 'কাজেই মাখবার সময় পুকুরের পানিতেই দাঁড়িয়েই যেন মাখে'। –কথাটি বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর : মজিদ রহীমাকে দিয়ে আমেনা বিবির জন্য পানিপড়া পাঠায়। বলে পাঠায়, এ পানি যেন মাখবার সময় পুকুরের পানিতেই দাঁড়িয়ে যেন মাখে। এ পানি দোয়া দরুদ পড়া পবিত্র পানি। এ পানি বাইরে পড়া অনুচিত। পুকুরে পড়লে তা পুকুরের পানির সঙ্গে মিশে যাবে। পুকুরের পানিতে সবাই গোসল করে, সেজন্য পুকুরের পানি নাপাক নয়। এ পানিতে দোয়া দরুদ পড়া পানি পড়লে ক্ষতি নেই।

প্রশ্ন : 'দুই তানিতে যে প্রচুর তফাৎ আছে সে কথা কী করে বোঝায়?' –কথাটি বুঝিয়ে দিন।

উত্তর : দুই তানির মধ্যে একজন মজিদ অন্যজন খালেক ব্যাপারী। রহীমার পেটে চৌদ্দ প্যাঁচ আছে এ কথা মজিদ কি করে জানে এ হল খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী তানু বিবির জিজ্ঞাসা। রহীমা উত্তর দেয়, স্বামী হওয়ার কারণে মজিদ বুঝতে পারে। তাহলে খালেক ব্যাপারী আমেনা বিবির স্বামী হয়েও কেন তার পেটের প্যাঁচের কথা জানে না। তানু বিবিকে এ কথা বোঝানো মুশকিল।

মজিদ আর ব্যাপারী যে এক মানুষ নয় তা বুঝতে হবে। মজিদ খোদার পথের মানুষ। সুতরাং সে খালেক ব্যাপারীর মত সাধারণ মানুষ নয়।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. এক ঢিলের পথ, কিন্তু ব্যাপারীর বউ হেঁটে যেতে পারে না।

২. তবে কথা হচ্ছে কী তেরো বছরের কথা একদিনে জানে নি, জেনেছে ধাপে-ধাপে ধীরে-ধীরে প্রতি বৎসরের শূন্যতা থেকে।

মেয়েলোকের মনের মস্করা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ।

ব্যাখ্যেয় অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে আমেনা বিবির কথা বলতে গিয়ে সমাজে মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে কটাক্ষ করা হয়েছে।

সন্তানের আশায় আমেনা বিবি মাজারের চারধারে পাক দিতে রাজি হয়। কিন্তু মাজারে যাওয়ার সময় হলে আমেনা বিবির মনে ভয় ঢোকে। ভবিষ্যতে কী আছে কে জানে। যদি আমেনা বিবির প্রয়াস ব্যর্থ হয়। সেই আশঙ্কায় আমেনা বিবি মাজারে যেতে আর আগ্রহ বোধ করে না। কিন্তু তবু তাকে যেতে হয়। কেননা সমাজে পুরুষেরই দাপট। নিঃসন্তান হওয়ার কারণে খালেক ব্যাপারীও আমেনা বিবিকে আগের মতো দেখে না। তা ছাড়া ব্যাপারী আরেকটা বিয়েও করেছে। সন্তানবতী হলেই কেবল আমেনা সমাজে টিকে থাকতে পারবে। সেজন্য আমেনা বিবির উৎসাহহীনতাকে সমাজ কোনোদিন মেনে নেবে না।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- আমেনা বিবির পা দেখে মজিদের প্রতিক্রিয়ার কথা লিখতে পারবেন।
- মাজারে পাক দেয়ার সময় আমেনা বিবির মূর্ছা যাওয়ার ঘটনা বিবৃত করতেপারবেন।

মূলপাঠ

মজিদ অপেক্ষা করছিলো। বেহারারা পাল্কিটা মাজার ঘরের দরজার কাছে আস্তে নামিয়ে রাখলো।

ব্যাপারী মজিদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আস্তে বলে, –নামবো?

মজিদ আজ লম্বা কোর্তা পরেছে, মাথায় ছোটখাটো একটা পাগড়িও বেঁধেছে। মুখ গম্ভীর। বলে,

–তানারে নামাইয়া মাজার ঘরের ভিতরে নিয়া যান। থেমে বলে, তানার ওজু আছে নি।

ব্যাপারী ছুটে যায় পাল্কির কাছে। পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে নিচু গলায় প্রশ্ন করে,

–আছে নি ওজু?

অস্পষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আমেনা বিবি জানায়, আছে।

–তয় নামেন।

মজিদ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ সে চিকন সুরে দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে, গলায় বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্যের খেলা হতে থাকে। কিন্তু তাতে চোখের তীক্ষ্মতা কাটে না। চোখ হঠাৎ তার তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। পাল্কির

পর্দা ফাঁক করে নামবার জন্য আমেনা বিবি যখন এক পা বাড়ায় তখন সুচের তীক্ষ্মতায় তার দৃষ্টি বিদ্ধ হয় সে পায়ে। সাদা মসৃণ পা, রোদ-পানি বা পথের কাদামাটি যেন কখনো স্পর্শ করেনি। মজিদের গলার কারুকার্য আরো সূক্ষ্ম হয়।

হলুদ রঙের বুটিদার চাদরটা আমেনা বিবি ঘোমটার ওপের টান করে ধরে রেখেছে। তবু পাল্কি থেকে নেমে সে যখন মাজার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আড়-চোখে তার পানে তাকিয়ে মজিদ কিছুটা বিস্মিত হয়। নোতুন বউ এর মত চোখ তার বোজা। তবে লজ্জায় যে নয় তা দ্বিতীয়বার তাকালেই বোঝা যায়। লজ্জায় ম্রিয়মান নোতুন বউ এর আত্মচেতন রক্তাভা তাতে নেই। সে-মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য, এবং সে-মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই।

আমেনা বিবি কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখটা আধাআধি খোলে। ঘরে ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। দুটো মোমবাতি ম্লানভাবে আলো ছড়ায়। সে-আলোয় সামনে সে দেখে ঝালরওয়ালা সালু কাপড়ে আবৃত চিরনীরব মাজারটি। সে-নীরবতা যেন বিস্ময়করভাবে শক্তিমান। আর সে-শক্তি বিদ্যুৎ-চমকের মত শত ফলায় বিচ্ছুরিত হয় প্রতি মুহূর্তে। মানুষের রক্তস্রোত যদি থেমেও থাকে তবে তার আঘাতে আশা ও বিশ্বাসের জোয়ার আসে ধমনিতে। তথাপি মহা-আকাশের মতই সে-মাজার প্রগাঢ়ভাবে নীরব, আর মহা-আকাশের মতই বিশাল ও অন্তহীন সে-নীরবতা। যে-আমেনা বিবি চোখ আধা খুলে তাকায় সেদিকে, সে আর পলক ফেলে না।

মজিদ আবার আড়চোখে তাকায় তার পানে। কী দেখে আমেনা বিবি? মাজারকে অমন করে কাউকে সে দেখতে দেখেনি। তার ঠোঁট বিড়বিড় করে, গলায় তেমনি সূক্ষ্মসুরের লহরি খেলে। কিন্তু এবার সে থামে, জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে গলা কাশে।

—তানারে বইবার কন

ব্যাপারী বিবিকে বলে,

—বহেন।

মাজারের ধারটিতে আমেনা বিবি আস্তে বসে। তাকায় না কারো পানে। মাজারের নীরবতা যেন তার বুক ভরিয়ে দিয়েছে। সন্তানের কামনা এক বৃহৎ সত্যের উপলব্ধির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, লোভ বাসনার অবসান হয়েছে। তাই হয়তো মজিদের ভয় হয়। সে আর তাকায় না এদিকে। তবু বিড়বিড় করে। নিজের ক্ষুদ্র কোটরাগত চোখে চমক জাগে থেকে থেকে।

ঘরের কোণে একটি পাত্রে পানি ছিলো। এবার সেটি তুলে নিয়ে মজিদ অন্য ধারে গিয়ে বসে। পানি পড়বে, যে-পড়াপানি খেয়ে আমেনা বিবি পাক দেবে। তার ঠোঁট তেমনি বিড়বিড় করে, হাতে পানির পাত্রটা তুলে নেয়া হয়তো-বা তা ঈষৎ দ্রুততর হয়। ঘরের মধ্যে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। এ-নিঃশব্দতার মধ্যে তার গলার অস্পষ্ট মিহি আওয়াজ কোন আদিম সাপের গতির মত জীবন্ত হয়ে থাকে। তার কণ্ঠে যদি সাপের গতি থাকে তবে তার মনেও এক উদ্যত সাপ ফণা তুলে আছে ছোবল মারবার জন্য। আমেনা বিবির বোজা চোখ মজিদের ভালো লাগে না, কিন্তু পাল্কি থেকে নামবার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিলো, সে-পাই তার মনে সাপকে জাগিয়ে তুলেছে। সাপ জেগে উঠেছে। ছোবল মারবার জন্য। তার জিহ্বা লিকলিক করে, উদ্যত দীর্ঘ গলা বেয়ে উঠে আসে বিষ। সুন্দর পা—দেখে সস্নেহ-মমতা উঠে না এসে, আসে বিষ। স্নেহ-মমতাই যদি গলগলিয়ে, গদগদ হয়ে জেগে উঠতো তবে মজিদ রূপালি ঝালরওয়ালা চমৎকার সালু কাপড়টাই ছিঁড়ে এখানকার ঘরবাড়ি ভেঙে অনেক আগে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যেতো। এবং যেতো সেখানেই যেখানে নির্মল আলো হাওয়া রোগ-জীবানু ভরা লালাসিক্ত কেতাবের জালির মধ্য দিয়ে নিঃসৃত হয়ে আসে না, উন্মুক্ত বিশাল আকাশপথে— যেখানে কাদামাটি লাগে নি এমন পা দেখে অন্তরে বিষাক্ত সাপ জেগে উঠে ফণা ধরে না।

থেকে-থেকে মজিদ পানিতে ফুঁ দেয়। আর আবছা আলোয় তার ক্ষুদ্র চোখ চক্কর খায়। কখনো তার দৃষ্টি খালেক ব্যাপারীর ওপরও নিবদ্ধ হয়। আজ তার পানে তাকিয়ে মজিদের মনে হয়, ব্যাপারীর মেদবহুল স্ফীতউদরসম্বলিত দেহটি কেমন যেন অসহায়। একটু তফাতে সে যে মাথা নিচু করে বসে আছে, সে-বসে-থাকার মধ্যে শক্তি নেই। সে কেমন ধ্বসে আছে, বিস্তর জমিজমাও ঠেস দিয়ে ধরে রাখতে পারেনি তার স্থূল দেহটা। চোখ আবার ঘোরে, চক্কর খায়। হলুদ রঙের বুটিদার চাদরের ঢাকা মুখটা এখান থেকে নজরে পড়ে না। তবু থেকে থেকে সেখানেই ঠক্কর খায় মজিদের ঘূর্ণমান দৃষ্টি।

এক সময় মজিদ উঠে দাঁড়ায়। গলা কেশে আস্তে বলে,

—পানিটা দেন।

ব্যাপারীও তার স্থূল দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে পানিটা নেয়, তারপর আমেনা বিবির মৃত মানুষের মত স্তব্ধ মুখের সামনে সেটা ধরে। আমেনা বিবি চোখ খুলে তাকায়, আস্তে, পাপড়ি খোলার মত। তারপর চাদরের তলে একটা হাত নড়ে। সে হাতটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে পাত্রটি যখন নেয় তখন একবার তার চুড়িতে অতি মৃদু ঝঙ্কার ওঠে।

আমেনা বিবি পাত্রটি কয়েক মুহূর্ত মুখের সামনে ধরে থাকে, তারপর তুলে ঠোঁটের কাছে ধরে। একটু পরে প্রগাঢ় নীরবতায় মজিদের সজাগ কানে সাবধানী বেড়ালের দুধ খাওয়ার মত চুকচুক আওয়াজ এসে বাজে। পান করার অধীরতা নেই। খোদার নামছোঁয়া পানি, তালাবের সাধারণ পানি নয়। তাছাড়া তৃষ্ণার পানিও নয় যে, শুষ্ক গলা নিমেষে শুষে নেবে সবটা। ধীরে ধীরে পান করে সে, বুকটা শীতল হয়। তারপর মুখ না ফিরিয়ে আস্তে শূন্য পাত্রটা বাড়িয়ে ধরে। পায়ের মত সুন্দর হাত। মোমবাতির পান আলোয় মনে হয় সে হাত শুধু সাদা নয়, অদ্ভুতভাবে কোমল।

হাতটি যখন আবার চাদরের তলে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন মজিদ বলে, —তানারে উঠবার কন। এহন পাক দেওন লাগব।

আমেনা বিবি উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েই মনে হয় বসে পড়বে, কিন্তু সামান্য দুলেই স্থির হয়ে যায়।

—আমি দোয়া-দরুদ পড়তাছি। তানারে পাক দিবার কন। ডাইন দিক থিকা পাক দিবেন, আগে ডাইন পা বাড়াইবেন। বাড়ানের আগে বিসমিল্লাহ কইবেন।

মজিদ কোণে বসে। একবার সামনে দিয়ে যখন আমেনা বিবি ঘুরে যায় তখন তার চোখ চকচক করে ওঠে আবছা অন্ধকারে। কালো রঙের পাড়ের তলে থেকে আমেনা বিবির পা নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে : একবার ডান পা, আরেকবার বাঁ। শব্দ হয় না। কাছাকাছি যখন আসে তখন মজিদের ভেতরে সাপের গলাটা সামান্য চম্‌কে পেছনে যায়, যেন ছোবল দেবে। মজিদ একবার ঢোক গেলে, তারপর কণ্ঠের সুর আরো মিহি করে তোলে।

একপাক, দুইপাক। আমেনা বিবি স্বপ্নের ঘোরে যেন হাঁটে। যে স্তব্ধতায় তার মুখ জমে আছে, সে স্তব্ধতায় বিন্দুমাত্র প্রাণ নেই। ও মুখ কখনো যেন কথা কয়নি, হাসেনি, কাঁদেনি। মনেও তার কিছু নেই। অতীতের স্মৃতির মত মনে পড়ে কী একটা বাসনার কথা—বছরে বছরে যে-বাসনা অপূর্ণ থেকে আরো তীব্রতর হয়েছে। কী একটা অভাবের কথা, কী একটা শূন্যতার কথা। কিন্তু সে-সব অতীতের স্মৃতির মত অস্পষ্ট। একটা মহাশক্তির সন্নিকটে এসে মানুষ আমেনা বিবির আর সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ নেই। একটা প্রখর-অত্যুজ্জ্বল আলো তার ভেতরটা কানা করে দিয়েছে। সেখানে তার নিজের কথা আর চোখে পড়ে না।

একপাক, দুইপাক। তারপর তিন পাকের অর্ধেক। ক-পা এগুলেই মজিদকে পেরিয়ে যাবে। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ বৈশাখী মেঘের আকস্মিক আবির্ভাবের মত কী একটা বৃহৎ ছায়া এসে আমেনা বিবিকে অন্ধকার করে দিলো। অর্থ না বুঝে মুখ ফিরিয়ে স্বামীর পানে তাকাবার চেষ্টা করলো, হয়তো-বা তাকে আলিঝালি দেখলেও। কিন্তু তারপর আর কিছু দেখলো না, জানলো না ক-প্যাঁচ পড়েছে তার পেটে, জানলো না-মাজারের মধ্যে শায়িত শক্তিশালী লোকটির কী বলবার আছে, ক-পাক দিলে তাঁর অন্তরে দয়া উথলে উঠতো।

ব্যাপারী বিদ্যুৎগতিতে উঠে পড়ে অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে বলে, —কী হইল?

চোখের সামনে আমেনা বিবি মূর্চ্ছা গেছে। বুটিদার চাদরটা আর হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারেনি বলে তার মুখটা খোলা। সে-মুখে দাঁত লেগে আছে।

বাইরে মাজারে রহীমা আসে না। আজ আমেনা বিবি এসেছে বলে হয়তো আসতো যদি না সঙ্গে থাকতো ব্যাপারী। মাজার ঘরের বেড়ার ফুটোতে চোখ পেতে সে ব্যাপারটা দেখছিলো। সঙ্গে হাসুনির মা-ও ছিলো। রহীমা মনে-মনে স্থির করেছিলো, পাক দেয়া চুকে গেলে আমেনা বিবিকে ভেতরে নিয়ে যাবে, সখ করে যে ফির্‌নিটা করেছে তা দেবে খেতে, তারপর দুয়েক খিলি পান চিবোতে চিবোতে দু-দণ্ড সুখ-দুঃখের গল্প করবে। নিজে সে স্বল্প ভাষী মানুষ, কিন্তু আমেনা বিবির হৃদয়ের সঙ্গে তার হৃদয়ের কোথায় যেন সমতা, যাই কথা হোক না কেন দেখতে দেখতে আলাপ জমে ওঠে। কিন্তু ফুটো দিয়ে রহীমা যে-দৃশ্য দেখলো তারপর গল্প গুজবের আশা তাকে ত্যাগ করতে হলো। ব্যাপারীর লজ্জা

কাটিয়ে বাইরে এসে সে আর হাসুনির মা অতিথিকে ভেতরে নিয়ে গেলো। নিয়ে গেলো পাঁজাকোল করে, মুখে কথা ফোটাবার উদ্দেশ্যে। সখ করে তৈরি করা ফির্‌নির কথা বা পান খেয়ে দু-দণ্ড গল্প করার কথা ভুলে গেলো।

শব্দার্থ ও টীকা

লম্বা কোর্তা – আল খাল্লা জাতীয় পোশাক। **ওজু** – নামাজ ও ধর্মীয় কাজ করার জন্য বিশেষ রীতিতে হাত পা ধোওয়া। **ঈষৎ** – সামান্য। **চিকন** – সূক্ষ্ম, মিহি। **কারুকার্য** – সূক্ষ্ম কাজ। **সূচের তীক্ষ্ণ তায়** – সূচের মতো তীক্ষ্ণ রূপে। **মসৃণ** – তেলতেলে। **বোজা** – বন্ধ। **ম্রিয়মান** – মরে যাচ্ছে এমন। **রক্তাভা** – লালচে রঙ। **দুনিয়ার ছায়া নেই** –মৃতের মতো। **ঝালর** – চাদর জাতীয় কাপড়ের ঝুলে থাকা অংশ এবং এটি কাজ করা থাকে। **সালু কাপড়** – লাল কাপড়। **ফলা** – অস্ত্রের তীক্ষ্ণ মুখ। **বিচ্ছুরিত** – ছড়িয়ে পড়া। **ধমনি** – শিরা। **অন্তহীন** – শেষ নাই যার। **আড়চোখে** – চোরা দৃষ্টিতে। **বিড়বিড়** – অস্পষ্ট কথা। **লহরি** – ঢেউ। **কোটরাগত** – গর্তে ঢোকানো। **বাসনা** – ইচ্ছা। **অবসান** – শেষ। **ছোবল** – সাপের কামড়। **আদিম** – অতি পুরাতন। **আদিম** – অতি পুরাতন। **লালাসিক্ত** – পোকার শরীর থেকে নির্গত আঠাযুক্ত। **জালি** – পোকায় কাটা ছিদ্র। **লিকলিক করা** – চিকন ও লম্বা জিনিসের নড়ন। **নিঃসৃত** – বের হওয়া। **চক্কর খায়** – চারদিকে ঘোরে। **নিবদ্ধ হয়** – পড়ে। **মেদবহুল** – চর্বিওয়ালা। **স্ফীত উদর সম্বলিত** – মোটা পেট যুক্ত। **ঘূর্ণমান** – যা ঘুরছে। **ধ্বসে আছে** – ভেঙে পড়ে গেছে। **ঠক্কর** – বাধা। **পাপড়ি** – ফুলের পাতা। **ঝঙ্কার** – বাদ্যযন্ত্রের কিংবা চুড়ি জাতীয় অলঙ্কারের আওয়াজ। **চুকচুক** – দুধ বা পানি খাওয়ার মৃদু আওয়াজ। **কোমল** – নরম। **পাড়** – শাড়ির প্রান্ত। **মিহি** – চিকন, সূক্ষ্ম। **স্তব্ধতা** – শব্দহীনতার অবস্থা। **প্রখর অতুজ্জ্বল** – তীক্ষ্ণ ও অতি উজ্জ্বল। **আবির্ভাব** – আগমন। **আলিঝালি** – অস্পষ্ট, এলোমেলো। **দয়া উথলে ওঠা** – বেশি করে দয়া হওয়া। **ফুটো** – ছিদ্র। **চুকে গেলে** – শেষ হলে। **দু-দণ্ড** – সামান্য সময়। **স্বল্পভাষী** – অল্প কথা বলে যে। **সমতা** – মিল। **পাঁজা কোল** – দুহাত বাড়িয়ে টেনে কোলে নেয়া। **মুখের কথা ফোটাবার উদ্দেশ্যে** – জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জগৎ। **খিলি** – ভাঁজ করা সাজানো পান।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যের অর্থ

নামাইয়া – নামিয়ে

তয় নামেন – তাহলে নামুন

তানারে বইবার কন – তাঁকে বসতে বলুন

বহেন – বসুন

তানারে উঠবার কন – তাঁকে উঠতে বলুন।

এহন – এখন

এহন পাক দেওন লাগব – এখন ঘুরতে হবে

পড়তাছি – পড়ছি

পাঠ সংক্ষেপ

আমেনা বিবিকে পালকি থেকে নামানো হয়। পালকি থেকে নামার সময় আমেনা বিবির সুন্দর মসৃণ পা দেখে মজিদের মনে কামভাব জাগে। মজিদের কাম চেতনাকে সাপের দংশনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তবে মজিদ বাইরে স্বাভাবিক থাকে। তার পানিপড়া খেয়ে আমেনা বিবি মাজারের চারদিকে পাক দিতে শুরু করে। মাজারের প্রতি তার গভীর বিস্ময়। তৃতীয় বার পাক দেয়ার সময় আমেনা বিবি চোখে অন্ধকার দেখে এবং মূর্ছা যায়। রহীমা হাসুনির মার সাহায্যে আমেনা বিবিকে ঘরের ভিতরে নিয়ে আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. যে সব শব্দ নতুন ভাবে জানলেন সেগুলো বারবার পড়ুন এবং অর্থ জেনে নিন।
২. আমেনা বিবি যখন পালকি থেকে নামে তখন তাকে কেমন দেখায়?
৩. আমেনা বিবি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে মাজারের দিকে তাকিয়ে থাকে কেন?
৪. মজিদের কামবাসনাকে সাপের দংশনের সঙ্গে কেন তুলনা করা হয়েছে?
৫. মাজার প্রদক্ষিণ করার সময় আমেনা বিবির মনোভাব কেমন হয়?
৬. প্রদক্ষিণ শেষ হলে আমেনা বিবিকে নিয়ে রহীমা কি করবে ভেবেছিল?
৭. এ পাঠের কাহিনী সংক্ষেপে লিখুন।

প্রশ্ন : আমেনা বিবি বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে মাজারের দিকে তাকিয়ে থাকে কেন?

উত্তর : আমেনা বিবি সন্তান পাওয়ার আশায় মাজারে এসেছে। মোমবাতির আলোয় মাজারকে বড় রহস্যময় মনে হয়। মাজারটি সালু কাপড়ে আবৃত এবং চির নীরব। আমেনা বিবির মনে হয় এই মাজারে মহাশক্তিমান কেউ রয়েছেন যিনি আমেনা বিবির ইচ্ছা পূরণ করবেন। সেই মহা শক্তির উপলব্ধিতে আমেনা বিবি অবাক চোখে মাজারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রশ্ন : মজিদের কাম বাসনাকে সাপের দংশনের সঙ্গে কেন তুলনা করা হয়েছে?

উত্তর : পালকি থেকে নামার সময় আমেনা বিবির সুন্দর ফর্সা পা দেকে মজিদ আকৃষ্ট হয় এবং আমেনা বিবির প্রতি তার কামভাব জাগে। কামভাব মানুষের মনের বিবেচনা শক্তি নষ্ট করে এবং তা জ্বালা-যন্ণা সৃষ্টি করে। সাপে কামড়ালে সাপের বিষে মানুষের শরীরে যেমন জ্বালা-যন্ণার সৃষ্টি হয়, তেমনি কামভাব জাগলে মানুষের দেহে ও মনে যন্ণা হয়। সেজন্য সাপের বিষ আর কামের ভাবের তুলনা ঠিকই হয়েছে।

প্রশ্ন : মাজার প্রদক্ষিণ করার সময় আমেনা বিবির মনোভাব কেমন হয়?

উত্তর : মাজারের চারদিকে ঘুরতে গিয়ে আমেনা বিবি কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। স্তব্ধ নীরব মাজারটিকে তার খুব কঠিন মনে হয়। আমেনা বিবির মনে হয় তার কোনো অনুভূতি নেই, কোনো কামনা বাসনা নেই, কোনো অভাব অভিযোগ নেই। মহাশক্তির কাছে এসে সে বিহ্বল হয়ে গেছে। মনে হয় সে যেন স্বপ্নের ঘোরে হাঁটছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. সে-মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য এবং সে মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই।
২. সন্তানের কামনা এক বৃহৎ সত্যের উপলব্ধির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, লোভ বাসনার অবসান হয়েছে।
৩. সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য। তার জিহ্বা লক লক করে, উদ্যত দীর্ঘ গলা বেয়ে উঠে আসে বিষ।
৪. একটা প্রখর অত্যুজ্জ্বল আলো তার ভেতরটা কানা করে দিয়েছে।

মানুষের রক্তস্রোত যদি থেমেও থাকে তবে তার আঘাতে আশা ও বিশ্বাসের জোয়ার আসে ধমনিতে।

এ অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। মাজারের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তির কথা এখানে বলা হয়েছে।

মাজারে এসেছে আমেনা বিবি সন্তান কামনায়। মাজারের নীরবতা তার মনের মধ্যে প্রভাব ফেলে। একজন শক্তিমান লোক এখানে শুয়ে আছেন। ভক্তিমান লোক সেই শক্তিতে বিশ্বাস রাখে। সে মনে করে ইনিই সব কিছু করে দিতে পারবেন। মানুষের বাসনা কামনা তিনিই পূরণ করবেন। পীরের কবরের প্রতি ভক্তি মরা মানুষের রক্তকেও যেন সজীব করে তোলে। আসলে পীরের প্রতি মানুষের ভক্তিপ্রীতি বেশি। আমেনা বিবি সেইটি উপলব্ধি করেছে এবং মাজারের শক্তিতে বিহ্বল হয়েছে।

সে কেমন ধ্বসে আছে, বিস্তর জমিজমাও ঠেস দিয়ে ধরে রাখতে পারে নি তার স্থূল দেহটা।

ব্যাখ্যার জন্য চয়ন করা বাক্যটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লার 'লালসালু' উপন্যাসের। এখানে খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনা বিবি সন্তান পাওয়ার আশায় মাজারের চারদিকে পাক দিতে এসেছে। খালেক ব্যাপারী ও স্ত্রীর জন্য মাজারে এসেছে এবং স্ত্রীকে মজিদের নির্দেশ জানিয়ে দিচ্ছে। খালেক ব্যাপারী মোটা মানুষ, তাছাড়া সে গ্রামের মাতব্বর। অথচ আজকে তাকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে। তার ভিতরেও যেন শক্তি নেই। স্ত্রীর সন্তান হবে কিনা সে জন্য তার দুশ্চিন্তা। তার এত বিষয় আশয় ও টাকা পয়সা থাকলে কি হবে, কোনো কিছুতেই যেন তার শান্তি নেই।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- আমেনা বিবিকে তালাক দেয়ার জন্য খালেক ব্যাপারীর প্রতি মজিদের বক্তব্য সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

মজিদ আর ব্যাপারী মাজার ঘরেই চুপ হয়ে বসে রইলো, দুজনের মুখে চিন্তার রেখা। তারপর মজিদ আস্তে উঠে অন্দরঘরের বেড়ার পাশে বৈঠকখানায় গিয়ে হুকা ধরিয়ে আবার ফিরে এসে ব্যাপারীকে ডেকে নিয়ে গেলো। দু-জনেই এক এক করে হুকা টানে, কথা নেই কারো মুখে।

মজিদ ভাবে এক কথা। যে-আমেনা বিবির পীরের পানি পড়া খাবার সখ হয়েছিলো সে-আমেনা বিবির ওপর –আকার ইঙ্গিতে বা মুখের ভাবে প্রকাশ না করলেও–মজিদের মনে একটা নিষ্ঠুর রাগ দেখা দিয়েছিলো। তার একটা নিষ্ঠুর শাস্তি ও সে স্থির করেছিলো। আজ সন্ধ্যার আবছা অস্পষ্ট আলোয় আমেনা বিবির সাদা কোমল পা দেখে শাস্তি বিধানের সে প্রবল ইচ্ছা বিন্দুমাত্র প্রশমিত না হয়ে বরঞ্চ আরো নিষ্ঠুরতমভাবে শাণিত হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অসময়ে আমেনা বিবির মূর্চ্ছা যাওয়া সমস্ত কিছু যেন গোলমাল করে দিলো। মুঠোর মধ্যে এসেও সে যেন ফস্কে গেলো, যে-মজিদের ক্ষমতাকে সে এতদিন উপেক্ষা করেছে তার প্রতি আজও অবজ্ঞা দেখালো, তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে সুযোগ দিয়েও দিলো না। দিয়েও দিলো না বলে মেয়েলোকটি যেন চরম বাহাদুরি দেখালো, সমস্ত আস্ফালনের মুখে চুন দিলো।

হুকাটা রেখে হঠাৎ এবার ব্যাপারী কথা বলে। বলে,

–দিনভর রোজা রাখনে বড় দুর্বল হইছিল তানি।

মজিদ কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, –রোজা রাখনে দুর্বল হইছিল কথাডা ঠিক, কিন্তু আমি যে পানিপড়াডা দিলাম–তা কিসের জন্য? শরীলে তা'কত হইবার জন্য না? এমন তাছির হেই পানিপড়ার যে পেটে গেলে একমাসের ভুখা মানুষও লগে লগে চাঙ্গা হইয়া ওঠে। শরীলের দুর্বলতার জন্য তিনি অজ্ঞান হন নাই।

মজিদ থামে। কী একটা কথা বলেও বলে না। ব্যাপারী মুখ ফিরিয়ে তাকায় মজিদের পানে, কতক্ষণ তার চিন্তিত-ব্যথিত চোখ চেয়ে-চেয়ে দেখে। তারপর প্রশ্ন করে,

–তয় ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন?

–আপনে তানার স্বামী–ক্যামনে কই মুখের উপরে?

হঠাৎ ব্যাপারীর চোখ সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে এবং তা একবার কানিয়ে চেয়ে লক্ষ্য করে দেখে মজিদ। ব্যাপারীর চোখে সন্দেহের জোয়ার আসুক, আসুক ক্রোধের অনলকণা। মজিদ আস্তে হুকাটা তুলে নেয়। তাকে ভাবতে সময় দিতে হবে। বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় জোৎস্না। তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় একবিন্দু রক্ত–টাট্‌কা, লাল টকটকে। খোলা দরজা দিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন ান জোৎস্নার পানেই চেয়ে থাকে মজিদ, দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার বোঝা। তাতে বিদ্বেষ নেই, পতিতের প্রতি ক্রোধ-ঘৃণা নেই, আছে শুধু অপরিসীম ব্যথা, হত প্রশ্নের নিশ্চুপতা।

আচ্‌মকা ব্যাপারী মজিদের একটি হাত ধরে বসে। তার বয়স্ক গলায় শিশুর আকুলতা জাগে। বলে,

–কন, ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন? ভিতরে কী কোন কথা আছে?

একবার বলে-বলে ভাব করে মজিদ, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে রসনা সংযত করে। মাথা নেড়ে বলে,

–না। কওন যায় না। থেমে আবার বলে, তয় একটা কথা আমার কওন দরকার। তানারে তালাক দেন।

আমেনা বিবিকে সে তালাক দেবে? তের বছর বয়সে ফুটফুটে যে মেয়েটি এসে তার সংসারে ঢোকে এবং যে এত বছর যাবৎ তার ঘরকন্না করছে, তাকে তালাক দেবে সে? সত্যি কথা, বড় বিবির প্রতি তার তেমন মায়া-মহব্বত নাই। কিছু থাকলেও তানু বিবির আসার পর থেকে তা ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু তবু বহুদিনের বসবাসের পর একটা সম্বন্ধ আড়ালে-আবডালে গজিয়ে না উঠেছে এমন নয়। তাই হঠাৎ তালাক দেবার কথা শুনে ব্যাপারী হকচকিয়ে ওঠে। তারপর কতক্ষণ সে বজ্রাহতের মত বসে থাকে।

মজিদ কিছুই বলে না। বাইরের ান জোৎস্নার পানে বেদনাভারি চোখে চেয়ে তেমনি স্থিরভাবে বসে থাকে। আর অপেক্ষা করে। অনেকক্ষণ সময় কাটলেও ব্যাপারী যখন কিছু বলে না তখন সে আলগোছে বলে,

–কথাডা কইতাম, কিন্তু এক কারণে এখন না কওনই স্থির করছি। তহুর বাপের কথা মনে আছে নি?

ব্যাপারী ভারি গলায় আস্তে বলে,

–আছে?

– হে তহুর বাপের কথা মাইন্‌ষেরা ভুইলা গেছে। এমন কী তার রক্তের পোলা-মাইয়ারাও ভুইলা গেছে। কিন্তু আমি ভুলবার পারি নাই। ক্যান জানেন?

যন্ত্রচালিতের মত ব্যাপারী প্রশ্ন করে,

–ক্যান?

–কারণ হেই ব্যাপার থিকা একটা সোনার মত মূল্যবান কথা শিখছি আমি। কথাডা হইলো এ : পাক-দিল আর গুণাগার দিল যদি এক সুতায় বাঁধা থাকে আর কেউ যদি গুণাগার দিলের শাস্তি দিবার চায় তখন পাক দিলই শাস্তি পায়। তহুর বাপের দিল সাফ আছিল, তাই শাস্তি পাইল হেই। এদিকে তারে কষ্ট দিয়া আমি গুণাগার হইলাম।

বর্তমানে মনটা বিক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপারী কথাটা বোঝে। তার ও আমেনা বিবির দিল এক সুতায় বাধা। আমেনা বিবিকে শাস্তি দিতে হলে আগে সে বন্ধন ছিন্ন করা চাই। অতএব তাকে তালাক দেয়া প্রয়োজন। মজিদ একবার ভুল করে একজন নিষ্পাপ লোককে এমন নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে যে, সে-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য অবশেষে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। তাকে কষ্ট দিয়ে মজিদ নিজেও গুণাগার হয়েছে, পাপীও ভাল মানুষের ওপর দুষ্ট আত্মার মত ভয় করে শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে। এমন ভুল মজিদ আর কখনো করবে না।

মজিদের হাত তখনো ব্যাপারী ছাড়েনি। সে-হাতে একটা টান দিয়ে ব্যাপারী অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

—আপনে কী কিছু সন্দেহ করেন?

—সন্দেহের কোন কথা নাই। পানিপড়াডা খাইয়া তানি যখন সাত পাক দিবার পারলেন না, মূর্ছা গেলেন, তখন তাতে সন্দেহের আর কোন কথা নাই। খোদার কালামের সাহায্যে যে-কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইর মত সাফ। আর বেশি আমি কিছু কমু না। তানারে তালাক দেন।

এ সময়ে হাসুনির মা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোমটা টেনে তেরছাভাবে দাঁড়ালো। ব্যাপারী প্রশ্ন করে,

—কী গো বিটি?

—তানার হুস হইছে। বাড়িতে যাইবার চাইতাছেন।

—মজিদের হাত ছেড়ে ব্যাপারী উঠে দাঁড়ালো। মুখ কঠিন। বেহারাদের ডেকে পাল্কিটা অন্দরে পাঠিয়ে দিল।

আমেনা বিবিকে নিয়ে সে-পাল্কি যখন কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় চাঁদের আলোর মধ্যে দিয়ে চলে কিছুক্ষণ পরে গাছগাছলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো, তখন মজিদ বৈঠকখানা ঘরের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যমনস্কভাবে খেলাল দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে; দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব। কোন কথা না কয়ে হঠাৎ ব্যাপারী চলে গেলো। তার মনের কথা জানা গেলো না।

হঠাৎ এক সময়ে একটা কথা স্মরণ হয় মজিদের। কথা কিছু না, একটা দৃশ্য—আবছা আলোয় দেখা কালো পাড়ের নিচে একটি সাদা কোমল পা। সে-পা দ্বিতীয়বার দেখলো না বলে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন আফসোস বোধ করে মজিদ। তারপর মনে মনেই সে হাসে। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র। যেখানে সাপ জাগে সেখানে আবার কোমলতার ফুল ফোটে। কিন্তু সে-ফুল শয়তানের চক্রান্ত। মজিদ শক্ত লোক। সাত জন্মের চেষ্টায়ও শয়তান তাকে কোন দুর্বল মুহূর্তে আচম্বিতে আক্রমণ করতে পারবে না। সে সদা হুঁশিয়ার।

কণ্ঠে দোয়া-দরুদের মিহি সুর তুলে মজিদ ভেতরে যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

সখ – ইচ্ছা। **শাস্তি বিধান** – শাস্তির ব্যবস্থা। **বিন্দুমাত্র** – সামান্য। **প্রশমিত** – থেমে যাওয়া, বন্ধ। **বরঞ্চ** – বরং। **শানিত** – তীক্ষ্ণ । **অপ্রত্যাশিতভাবে** – আকস্মিকভাবে। **ফস্কে গেল** – হাতছাড়া হল। **অবজ্ঞা** – অসম্মান, ঘৃণা। **আস্ফালন** – বাহাদুরি। **দিনভর** – সারাদিন। **তাকত** – শক্তি। **মুখে চুন দেয়া** – গর্ব খর্ব করা। **তাছির** – প্রভাব। **ভুখা** – ক্ষুধার্ত। **কানিয়ে চেয়ে** – আড়াচোখে দেখে। **অনলকণা** – আগুনের স্ফুলিঙ্গ। **কুয়াশাচ্ছন্ন** – কুয়াশায় ঘেরা। **কুপি** – বাতি। **শিখা** – আগুনের শিষ। **টাট্‌কা** – তাজা। **বিদ্বেষ** – ঘৃণা। **টকটকে** – উজ্জ্বল। **পতিত** – পাপী, ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত। **হত প্রশ্নের নিশ্চুপতা** – প্রশ্ন করে লাভ নেই, সেজন্য চুপ হয়ে থাকা। **রসনা** – জিহ্বা। **সংযত** – দমন। **তালাক** – বিবাহ বিচ্ছেদ। **ফুটফুটে** – সুশ্রী, সুন্দর। **ঘরকন্না** – সংসার, ঘরের কাজ। **মায়া-মহব্বত** – প্রেম, ভালোবাসা। **আড়ালে-আবড়ালে** – অজান্তে, গোপনে। **হকচকিয়ে ওঠা** – হতভম্ব হওয়া, বিস্মিত হওয়া। **বেদনাভারি** – অতি ব্যথিত। **যন্চালিত** – যন্ত্রের মত চলা। **পাক দিল** – পবিত্র হৃদয়। **গুণাগার দিল** – অপবিত্র হৃদয়। **গুণাগার** – পাপী। **বিক্ষিপ্ত** – অস্থির। **দুষ্ট আত্মা** – ভূত প্রেত। **রোশনাই** – আলো, আলোর উজ্জ্বলতা। **তেরছাভাবে** – বাঁকাভাবে। **হুস** – জ্ঞান। **গাছগাছলা** – গাছ ও ঝোপঝাপ। **অন্যমনস্কভাবে** – আনমনাভঙ্গিতে। **অনিশ্চয়তা** – সংশয়, সন্দেহ। **চক্রান্ত** – দুষ্ট বুদ্ধি, ষড়যন্ত্র। **আচম্বিতে** – হঠাৎ, আচমকা। **সদা** – সবসময়। **হুঁশিয়ার** – সাবধান।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্য

রাখলে – রাখার জন্য।

দিনভর রোজা রাখনে বড় দুর্বল হইছিল তানি – সারাদিন রোজা রাখায় তিনি বড় দুর্বল হয়েছিলেন।

শরীল – শরীর।

শরীলে তাকত হইবার জন্য না? – শরীরে শক্তি হওয়ার জন্য নয়?

এমন তাছির হেই পানি পড়ার যে পেটে গেলে এক মাসের ভুখা মানুষও লগে লগে চাঙ্গা হইয়া ওঠে – সেই পানিপড়ার এমন প্রভাব যে, পেটে গেলে এক মাসের ক্ষুধার্ত মানুষও সঙ্গে সঙ্গে সতেজ হয়ে ওঠে।

তয় কেন তানি অজ্ঞান হইছেন – তাহলে কেন তিনি অজ্ঞান হয়েছেন?

কওন – বলা।

তহুর বাপ – তাহেরের বাপ, হাসুনির মায়ের বাপ।

মাইন্ষেরা – মানুষেরা।

হে তহুর বাপের কথা ভুইলা গেছে – সেই তাহেরের বাপের কথা মানুষেরা ভুলে গেছে।

ভুলবার পারি নাই – ভুলতে পারিনি।

দিবার চায় – দিতে চায়।

শাস্তি পাইল হেই – শাস্তি পেল সেই।

কিছু কমু না – কিছু বলব না।

তানার হুস হইছে – তাঁর জ্ঞান ফিরেছে।

বাড়িতে যাইবার চাইতাছেন – বাড়িতে যেতে চাইছেন।

পাঠ সংক্ষেপ

পীরের পানিপড়া খেতে চেয়েছিল বলে আমেনা বিবির ওপর বেজায় রাগ হয়েছিল, তাকে একটি শক্ত শাস্তি দিতে চেয়েছিল সে। কিন্তু আমেনা বিবি মূর্ছা যাওয়াতে সব গোলমাল হয়ে গেল। মজিদ খালেক ব্যাপারীকে বোঝাতে চায় যে, রোজা রাখার জন্য দুর্বল হয়ে আমেনা বিবি মূর্ছা যায়নি; অন্য কারণ আছে। এভাবে মজিদ ব্যাপারীর মনে সন্দেহ ঢোকাতে চায়। পানিপড়া খেয়ে আমেনা বিবি যখন সাত পাক দিতে পারল না তখন আর সন্দেহ নেই যে আমেনা বিবি অপবিত্র। মজিদ ব্যাপারীকে সরাসরি বলে আমেনা বিবিকে তালাক দিতে। ব্যাপারী হতভম্ব হয়ে পড়ে। মজিদ বড় নিষ্ঠুর ও প্রতিশোধকামী; আমেনা বিবির জন্য তার মনের মধ্যে সামান্যতম কোমল ভাব নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. এ পাঠের মূল কথা সংক্ষেপে লিখুন।
২. এ পাঠে ব্যবহৃত আঞ্চলিক বাক্যগুলোর শিষ্টরূপ দিন।
৩. মজিদ আমেনা বিবির প্রতি ক্রুদ্ধ কেন?
৪. স্ত্রীর সঙ্গে খালেক ব্যাপারীর সম্পর্ক কেমন?
৫. মজিদ কোন কথা বলে ব্যাপারীর মনে সন্দেহ ঢোকাতে চায়?
৬. তাহেরের বাপের ঘটনা থেকে মজিদ কোন্ কথাটি শিখেছে?
৭. মজিদ এত নিষ্ঠুর কেন?

প্রশ্ন : মজিদ আমেনা বিবির প্রতি ক্রুদ্ধ কেন?

উত্তর : আমেনা বিবি সন্তানের আশায় আওয়ালপুরের পীর সাহেবের পানিপড়া খেতে চেয়েছিল। মজিদ যখন ব্যাপারটি জেনে গেল, তখন তার রাগ গিয়ে পড়ল আমেনা বিবির ওপর। মজিদ মহব্বতনগরের ধর্মগুরু। তাকে বাদ

দিয়ে অন্য গ্রামের পীর সাহেবের কাছ থেকে পানিপড়া আনা তার জন্য অবজ্ঞাসূচক। এজন্য মজিদ আমেনা বিবির ওপর এত ক্রুদ্ধ।

প্রশ্ন : মজিদ কোন্ কথা বলে ব্যাপারীর মনে সন্দেহ ঢোকাতে চায়?

উত্তর : মাজারের চার ধারে ঘুরতে গিয়ে আমেনা বিবি মূর্ছিত হয়ে পড়ে। মজিদের মতে ও মূর্চ্ছা কারণ শরীরের দুর্বলতা নয়। আল্লাহর কালাম পড়া পানি মিথ্যা হতে পারে না। আমেনা বিবি যখন সাত পাক দিতে পারল না তখন কোন সন্দেহ নেই যে আমেনা বিবির মধ্যে পাপ রয়েছে। সূর্যের আলোর মতো তা স্পষ্ট। এ রকম কথা বলে মজিদ ব্যাপারীর মনে সন্দেহ জাগাতে চায়।

প্রশ্ন : তাহেরের বাপের ঘটনা থেকে মজিদ কোন্ কথাটি শিখেছে?

উত্তর : মজিদ বলতে চায়, তাহেরের বাপের ঘটনা থেকে মজিদ সোনার মত একটি মূল্যবান কথা শিখেছে। তা হল, অপবিত্র মন ও পবিত্র মন যদি এক সূতায় বাঁধা থাকে, তাহলে অপবিত্র মনকে কেউ শাস্তি দিতে চাইলে পবিত্র মনই শাস্তি পায়, অপবিত্র মন নয়। তাহেরের মা অপবিত্র ছিল, কিন্তু শাস্তি পেল পবিত্র-মন তাহেরের বাপ।

প্রশ্ন : মজিদ এত নিষ্ঠুর কেন?

উত্তর : মজিদ শক্ত হৃদয়ের মানুষ। তার মনে কোন কোমলতা নেই। কোমলতা দেখাতে সে মহব্বতনগরে টিকে থাকতে পারত না। যে তাকে আবজ্ঞা করেছে কিংবা উপেক্ষা করেছে তাকে সে সরাবেই। যে তার বিরুদ্ধে গেছে তাকে সে শাস্তি দেবেই। আমেনা বিবির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, সুতরাং তার প্রতি সে কোমল হতে পারত। কিন্তু আমেনা বিবি তাকে অবজ্ঞা করেছে, সেজন্য আমেনা বিবির জন্য তার হৃদয়ে কোন জায়গা নেই।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না। তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় এক বিন্দু রক্ত - টাককা, লাল টকটকে।

২. খোদার কালামের সাহায্যে যে কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইয়ের মত সাফ।

৩. দুনিয়াটা বড় বিচিত্র।

যেখানে সাপ জাগে সেখানে আবার কোমলতার ফুল ফোটে।

এ অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে আমেনা বিবির প্রতি মজিদের মনোভাবের কথা জানা যায়।

মজিদ খালেক ব্যাপারীকে বলেছে আমেনা বিবিকে তালাক দিতে। কারণ আমেনা বিবি শুদ্ধ বা পবিত্র নয়। দোয়া দরুদ পড়া পানি খেয়েও আমেনা বিবি মাজারে সাত পাক দিতে পারেনি। এতে সন্দেহ নেই যে আমেনা বিবি নিশ্চয়ই কোন পাপ করেছে। আসলে এটি মজিদের চক্রান্তের ফল। আমেনা বিবির প্রতি তার ক্রোধ রয়েছে। অথচ এই আমেনা বিবির প্রতিই সে আকৃষ্ট হয়। তার সাদা কোমল পা দেখে কামনা জাগে। কিন্তু মজিদ জানে এ কোমলতার প্রশ্রয় দেয়া চলে না। দুনিয়াটা অদ্ভুত। নিষ্ঠুরতা ও প্রেম একই সঙ্গে চলে।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- আমেনা বিবিকে খালেক ব্যাপারীর তালাক দেয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

এতবড় সমস্যা ব্যাপারীর জীবনে কখনো দেখা দেয়নি। নিজের চোখে কোন গুরুতর অন্যায় দেখে যদি শরীরে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতো তাহলে ব্যাপারটা সমস্যাই হতো না। আসল কথা জানে না, আবার একটা কিছু গোলযোগ যে আছে এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মানুষ মজিদের কথা না হয় অবিশ্বাস করা যেতো, কিন্তু যে-কথা জেনেছে মজিদ তা তার নিজের বুদ্ধির জোরে জানেনি। খোদার কালামের সাহায্যেই সে-কথা জেনেছে এবং মানুষ মজিদ তার অন্তরের বিবেচনার জন্যই তা খুলে বলতে পারেনি। হাজার হলেও তারা বন্ধু মানুষ। ব্যাপারী কষ্ট পাবে এমন কথা কী করে বলে।

বৈঠকখানা হুকার নীলাভ ধোঁয়া অন্ধকার হয়ে ওঠে। ব্যাপারীর চোখে ধোঁয়া ভাসে, মগজেও কিছু গলিয়ে ঢুকে তার অন্ত রদৃষ্টি আবছা করে দেয়। ব্যাপারী ভাবে আর ভাবে। মানুষের সঙ্গে হু-হাঁ করে কথা কয়, দশ প্রশ্নে এক জবাব দেয়। একটা কথাই মনে ঘোরে। এক সময়ে সেটা সোজা মনে হয়, এক সময়ে কঠিন। এক বার মনে হয় ব্যাপারটা হেস্ত-নেস্ত হয় একটি মাত্র শব্দের তিনবার উচ্চারণেই; আরেকবার মনে হয়, সে শব্দটা উচ্চারণ করাই ভয়ানক দুরূহ ব্যাপার। জিহ্বা খসে আসবে তবু সেটা বেরিয়ে আসবে না মুখ থেকে।

তের বছর বয়স থেকে যে তার ঘরে বসবাস করছে, তার জীবনের অলি-গলির সন্ধান করে। যদি কিছু নজরে পড়ে যায় হঠাৎ। দীর্ঘ বসবাসের সরল ও জানা পথ ছেড়ে ঝোপ-ঝাড় খোঁজে, ডালপালা সরিয়ে অন্ধকার স্থানে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু আপত্তিকর কিছুই নজরে পড়ে না। আমেনা বিবি রূপবতী, কিন্তু কোনদিন তার রূপের ঠাট ছিলো না, সৌন্দর্যের চেতনা ছিলো না; চলনে-বলনে বেহায়াপনাও ছিলো না। ঠাণ্ডা, শীতল, ধর্মভীরু ও স্বামীভীরু মানুষ। সে এমন কী অন্যায় করতে পারে?

প্রশ্নটা মনে জাগতেই মজিদের একটা কথা হুঙ্কার দিয়ে যেন তাকে সাবধান করে দেয়। কথাটা মজিদ প্রায়ই বলে। বলে, মানুষের চেহারা বা স্বভাব দেখে কিছু বিচার করা যায় না। তাকে দিয়ে কিছু বিশ্বাসও নেই। এমনকাজ নেই দুনিয়াতে যা সে না করতে পারে এবং করলে সব সময়ে যে সমাজের কাছে ধরা পড়বে এমন নয়। কিন্তু খোদার কাছে কোন ফাঁকি নেই। তিনি সব দেখেন, সব জানেন। কথাটা ভাবতেই ব্যাপারীর কান দুটোতে রঙ ধরে। পশুপক্ষীকেও না জানতে দিয়ে কোন গর্হিত কাজ ব্যাপারী কী কখনো করেনি? ব্যাপারীর মত লোকও করেছে, যদিও আজ বললে হয়তো অনেকে তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সে-কথা খোদাতা'লা ঠিক জানেন তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না।

না, মজিদের কথায় ভুল নেই। সহসা খালেক ব্যাপারী মনস্থির করে ফেলে।

এবং এর তিন দিন পর যে-আমেনা বিবি হঠাৎ সন্তান-কামনায় অধীর হয়ে উঠেছিলো সে-ই সমস্ত কামনা-বাসনা বিবর্জিত একটা স্তব্ধ, বজ্রাহত মন নিয়ে সেদিনের পাল্কিতে চড়ে বাপের বাড়ি রওয়ানা হয়। বহুদিন বাপের বাড়ি যায়নি। তবু সেখানে যাচ্ছে বলে মনে কিছু আনন্দ নেই। পাল্কির ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় চোখ মেলে নাক বরাবর তাকিয়ে থাকে বটে কিন্তু তাতে অশ্রুও দেখা দেয় না।

তবে পথে একটা জিনিস দেখলে হয়তো হঠাৎ তার বুক ভাসিয়ে কান্না আসতো। সেটা হলো থোতামুখো তালগাছটা। বহু দিনের গাছ, ঝড়ে-পানিতে আরো লোহা হয়ে উঠেছে যেন। প্রথম যৌবনে নাইয়র থেকে ফিরবার সময় পাল্কির ফাঁক দিয়ে এ-গাছটা দেখেই সে বুঝতো যে, স্বামীর বাড়ি পৌঁছেছে। ওটা ছিলো নিশানা, আনন্দের আর সুখের।

শব্দার্থ ও টীকা

দাউ-দাউ – বেশি জোরে আগুন জ্বলার ভাব। **গোলযোগ** – গন্ডগোল, ঝামেলা। **বিবেচনা** – খুঁটিয়ে দেখা। **নীলাভ** – নীল রঙের । **চোখে ধোঁয়া ভাসে** – চোখ ঝাপসা দেখে। **গলিয়ে ঢোকা** – কোন একটি পথে ঢুকে যাওয়া। **অন্তর দৃষ্টি** – মনের চোখ। **হেস্ত-নেস্ত** – মীমাংসা, নিস্পত্তি। **খসে আসবে** – আলাদা হয়ে আসবে। **দুরূহ** – কঠিন। **জীবনের অলি-গলি** – জীবনের নানা পথ। **আপত্তিকর** – দোষের **ঠাট** – গর্ব, আড়ম্বর। **বেহায়াপনা** – লজ্জাহীনতা **চলনে-বলনে** – আচার আচরণে। **হুঙ্কার** – সাবধান বাণী। **কান দুটোতে রঙ ধরে** – লজ্জা হয়। **গর্হিত** – অন্যায়। **মনস্থির** – সংকল্প। **বিবর্জিত** – সম্পর্ণরূপে বাদ।

সংকীর্ণতায় – অপরিসর জায়গায়। **নাক বরাবর** – সোজা, সম্মুখ। **থোতামুখো** – ডালপালাহীন। **ঝড়ে-পানিতে** – সকল আঘাতে। **লোহা** – শক্ত। **নাইয়র** – বাড়ি। **নিশানা** – চিহ্ন।

পাঠ সংক্ষেপ

খালেক ব্যাপারী জীবনের সব চাইতে বড় সমস্যায় পড়েছে। বিনা দোষে আমেনা বিবিকে সে তালাক দেবে কি করে! তাদের দাম্পত্য জীবন দীর্ঘ দিনের। রূপবতী স্বামীভীরু আমেনা বিবি কোনদিন কোন অন্যায় করেনি। ভেবে ভেবে খালেক ব্যাপারী অস্থির হয়। কিন্তু মজিদের কথা সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। মজিদ যা কিছু জেনেছে খোদার কালামের সাহায্যে জেনেছে। মানুষের ভিতরের কথা কিছুই বোঝা যায় না। খোদাই সব কিছু দেখেন এবং জানেন। মজিদের কথাই ঠিক। এর পর ব্যাপারী আমেনা বিবিকে তালাক দেয়। বজ্রাহত মন নিয়ে আমেনা বিবি বাপের বাড়িতে চলে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. খালেক ব্যাপারীর জীবনের সব চাইতে বড় সমস্যা কোনটি? কেন এটি বড় সমস্যা?
২. খালেক ব্যাপারীর চোখে আমেনা বিবি কি রকম?
৩. খালেক ব্যাপারী মজিদের কথা ঠিক মনে করল কেন?
৪. কোন জিনিসটি দেখলে আমেনা বিবির কান্না আসত? কেন?
৫. আপনি ভেবে চিন্তে লিখুন কেন আমেনা বিবিকে তালাক দিতে মজিদ ব্যাপারীকে পরামর্শ দিল?

প্রশ্ন : খালেক ব্যাপারীর জীবনের সব চাইতে বড় সমস্যা কোনটি? কেন এটি বড় সমস্যা?

উত্তর : খালেক ব্যাপারীর জীবনের সব চাইতে বড় সমস্যা হল আমেনা বিবিকে তালাক দেয়া। মজিদ আমেনা বিবিকে তালাক দিতে বলেছে। কিন্তু ব্যাপারী আমেনা বিবির মধ্যে কোন অন্যায় দেখেনি। সেজন্য নির্দোষ আমেনাকে তালাক দেয়া তার জন্য বড় সমস্যা।

প্রশ্ন : খালেক ব্যাপারীর চোখে আমেনা বিবি কি রকম?

উত্তর : খালেক ব্যাপারী ও আমেনা বিবির দাম্পত্য জীবন দীর্ঘ দিনের। আমেনা বিবির ব্যবহারে ব্যাপারী কোনদিন কোন আপত্তিকর কিছু দেখেনি। আমেনা বিবি রূপবতী, কিন্তু ঠাণ্ডা, শীতল, ধর্মভীরু এবং স্বামীর প্রতি ভক্তি পরায়না।

প্রশ্ন : খালেক ব্যাপারী মজিদের কথা ঠিক মনে করল কেন?

উত্তর : খালেক ব্যাপারী বিশ্বাস করে মজিদ কোরান কেতাব পড়া আলেম মানুষ, সে একজন পীর। মজিদ আমেনা বিবি সম্পর্কে যা জেনেছে খোদার কালাম পড়েই জেনেছে। সে জন্য সে আমেনা বিবিকে তালাক দিতে বলেছে। আমেনা বিবি বাইরের দিক থেকে নির্দোষ, তার আচারে ব্যবহারে আপত্তিকর কিছু নেই। কিন্তু তার ভিতরে নিশ্চয় কোন গলদ আছে, তা না হলে মজিদ তালাকের কথা বলত না।

প্রশ্ন : কোন জিনিসটি দেখলে আমেনা বিবির কান্না আসত? কেন?

উত্তর : পথের মধ্যে থোতামুখ তালগাছটি দেখলে আমেনা বিবির কান্না আসত। বহু প্রাচীন গাছ এটি। প্রথম যৌবনে বাপের বাড়ি থেকে ফিরবার সময় পাল্‌কির ফাঁক দিয়ে গাছটি দেখলে সে বুঝত স্বামীর বাড়ি পৌঁছেছে। বিবাহিত নারীর আসল ঠিকানা তার স্বামীর বাড়ি। এখানেই তার আনন্দ আর সুখ। সেই সুখের জায়গা ছেড়ে সে

চিরকালের জন্য বাপের বাড়িতে চলে যাচ্ছে। সুতরাং স্বামীর বাড়ি থেকে চলে যাবার সময় ঐ গাছটি যদি দেখত তাহলে তার বুক ভাসিয়ে কান্না আসাই স্বাভাবিক।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

দীর্ঘ বসবাসের সরল ও জানা পথ ছেড়ে ঝোপ-ঝাড় খোঁজে, ডালপালা সরিয়ে অন্ধকার স্থানে থমকে দাঁড়ায়।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। আমেনা বিবিকে তালাক দেয়ার প্রস্তাবে স্ত্রী সম্পর্কে খালেক ব্যাপারীর মনোভাব এখানে প্রকাশ করা হয়েছে।

আমেনা বিবির প্রতি আক্রোশবশত মজিদ খালেক ব্যাপারীকে মন্ত্রণা দিয়েছে আমেনা বিবিকে তালাক দিতে। কিন্তু আমেনা বিবির কি দোষ তা ব্যাপারী বুঝে উঠতে পারে না। ব্যাপারী চিন্তায় পড়ে যায়। হুঁকো খেতে খেতে চিন্তা করে। আমেনা বিবির সঙ্গে তার বিবাহিত জীবন বহু দিনের। তের বছর বয়সে আমেনা বিবি বউ হয়ে তার ঘরে এসেছিল। আমেনা বিবির চলা ফেরায় ও আচার-আচরণ অতি চমৎকার। কোথাও তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখা যায় নি। গভীর ভাবে চিন্তা করেও ব্যাপারী আমেনা বিবির মধ্যে সন্দেহজনক কিছু পায়নি। এখন তার অন্যায়টা কী সেটাই প্রশ্ন।

ওটা ছিলো নিশানা, আনন্দের আর সুখের।

এ বাক্যটি সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। স্বামীর বাড়ি যে আমেনা বিবির জন্য সুখের স্থান ছিল তা এই বাক্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

মজিদের কথায় খালেক ব্যাপারী বিনা দোষে আমেনা বিবিকে তালাক দিল। তালাকনামা পেয়ে আমেনা বিবি স্তব্ধ হয়ে গেল। স্বামীর সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল। সন্তান না হওয়ার জন্য স্বামী তাকে এতদিন পরে তালাক দেবে এটা ভাবাই যায় না। এরপর বাপের বাড়ি যাওয়া ছাড়া আমেনা বিবির অন্য গতি নেই। বাপের বাড়ি যেতে পারলে আনন্দ। কিন্তু আজ আনন্দ নেই, চোখের পানিও শুকিয়ে গিয়েছে। তবে একটি জিনিস দেখলে আমেনা বিবি নিশ্চয়ই কান্নায় বুক ভাসাত। সেটা হল একটি থোতামুখো তালগাছ। বহু দিনের গাছ; শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে এক ঠায়। বিয়ের পর আমেনা বিবি যখন বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়িতে ফিরে আসত, তখন পালকির ফাঁক দিয়ে ঐ গাছটি দেখলেই বুঝত, সে স্বামীর বাড়িতে এসে গেছে। মনটা তখন আনন্দে ভরে যেত। কারণ সে বিবাহিত নারী, স্বামীর বাড়িতেই সে সকল সুখ পেয়েছে। সে জন্য ঐ তালগাছটি হল সুখ আর আনন্দের প্রতীক।